রদংকাবা

বিঝু-২০১৯খ্রিঃ

সম্পাদক

নির্মল কান্তি চাকমা

সহ-সম্পাদক

জয়েস চাকমা

বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি

(একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠন)

বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

প্রকাশকাল

বিঝু

১৩ এপ্রিল-২০১৯খ্রিঃ

সম্পাদক

নির্মল কান্তি চাক্‌মা

সহ-সম্পাদক

জয়েস চাকমা

সম্পাদনা সহযোগীতায়

শান্তি চাকমা, অনুদেব চাকমা, নোবেল চাকমা তমেশ, বিপ্লব চাকমা, অনেজ কান্তি চাকমা, প্রশস্তি চাকমা, ধীরা তালুকদার ও রতন মণি চাকমা।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

লিটন চাকমা অন্নদা ও বিপ্লব চাকমা

প্রচ্ছদ

মামুন হোসাইন

বর্ণ বিন্যাস

বিশ্বময় চাকমা

মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে

ছড়াথুম পাবলিশার্স, রাঙামাটি।

শুভেচ্ছা মূল্য

১৫০/- টাকা

যোগাযোগ
বনযোগীছড়া কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সমিতি
বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

ই মেইল: bkkksrj@yahoo.com

www.banajogichara.org

Contact Adress:
Banajogichara Kishor
Kishori Kalyan Samity
Banajogichara, Jurachari
Rangamati Hill District
e-mail:
bkkksrj@yahoo.com

সম্পাদকীয়

পাত্তুরুতুরু,
'বিঝু' যুগের পর যুগ ধরে চলছে নির্দিষ্ট সময় পর পর। বিঝু পেগ (পাখি) ডাকছে 'কাট্টোল পাগোক, বিঝু এযোক' (কাঠাল পাঁকবে, বিঝু আসবে) বলে। সেই ডাকে বিঝু দিনের কথা মনে পড়ে গেল, পাহড়ে বিঝু ফুল পাপড়ি মেলে সুগন্ধি ছড়াচ্ছে এবং চারদিকে বিঝু দিনের জন্য নানা প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেল। পিবির ঢাকায় কোন এক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, স্বপ্ন তার পড়ালেখা শেষ করে সমাজ উন্নয়নের কাজ করবে। সকালে পিবির ঘুম থেকে উঠে দেখল মায়ের মিসকল, তাই মাকে ফোন দিল। মা জিজ্ঞেস করে ছুটি কবে থেকে, বিঝুতে আসবে কি না। পিবির বলল তাঁর এবার বাড়িতে আসা হবেনা, ঢাকতে থাকবে। মা জিজ্ঞেস করে কেন আসবেনা, উত্তরে পিবির জানায় পাহাড়ের পরিস্থিতি এ মুহূর্তে ভাল না তাই আসবেনা। মায়ের মনটা খারাপ হয়ে গেল ছেলে আসবেনা শুনে।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির পর পিবিরের মত সাধারণ মানুষের মনে এখন এক ধরনের আতংক বিরাজ করছে। একদিকে অগণতান্ত্রিক রাজত্ব, অন্যদিকে ধর্ষণ, ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত, পাহাড় দখল, গ্রেপ্তার অভিযান সবকিছু মিলিয়ে এখন অস্থিতিশীল পরিস্থিতি। আসুন, সুষ্ঠু আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ে সুষ্ঠু আন্দোলন করি যাতে আমরা সকলেই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারি। নিরাপদ ও সৃজনশীল সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে আপনার মেধার অংশগ্রহণ করুন। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলি। প্রতিবছরের ন্যায় সংকলন প্রকাশনার ধারাবাহিকতা সফল করার জন্য বিঝু সংকলন প্রকাশনা পর্ষদ এবং বকিকিকস এর উপদেষ্টা পর্ষদ সহ সকল সদস্যদের কাছে কৃতজ্ঞা জানাচ্ছি।

সূচী

প্রবন্ধ

সুপ্রিয় তালকদার/মঙ্গোলয়েড নৃ-বংশ ও বিস্তৃতি-৭
পরিমল চাকমা/মিজোরামের চাকমাদের সম্পর্কে কিছু কথা-১৬
ধীর কুমার চাকমা/ অতীত,বর্তমান ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের হিল চাদিগাঙ-২২
শুভ্র জ্যোতি চাকমা/চাকমা জাতিসত্ত্বার উদ্ভব সম্পর্কিত ধারণা-৩৯
লালন কান্তি চাকমা/ফটোগ্রাফ-৪৬
সুমঙ্গল চাকমা/শব্দ, ধ্বনি এবং জ্ঞাতিবাচক শব্দের সাক্ষ্য-৫৫
ইয়াংঙান ম্রো/ লোভের পরিণাম-৬৩
Kuldip Roy/Looking back on Cloudy Mountain-৬৫

চাকমা কবিতা

জগৎ জ্যোতি চাকমা/বোজেগর বেল্লে মাধানত তুই-৭০
পি কান্তি চাকমা/ দেবাঝরত-৭১
কিশলয় চাকমা /মুরগুজি থানা মানে-৭২
নমদীশ চাকমা/বসন্ত দিনত-৭৩
নির্মল কান্তি চাকমা/দ্বি পিরির কথা-৭৪
শোভা রানী চাকমা/আওজর পরান্যে-৭৫
তেজেন্দ্র চাকমা/ধর্মর মার-৭৬
পহ্র চাঙমা/চোগপানি ঝরঝরে ব'-৭৭
বিকেন চেগে/তিনকুরি বঝরর ফাগুনত-৭৮
রুপসী চাকমা/ভাবনা সাগরত-৭৯
শান্তি প্রিয় চাকমা/এয' মাহ্ ভাঝে কথা কৈ-৮০
এ্যাপোলো চাকমা/ঔঝো জুম্ম ভেই- বোনুন-৮১
শান্তি প্রিয় চাকমা/ ফিরি এযোক আহ্রেয়ে দিনুন-৮২
বিপম চাকমা/যে গাজে ন চিনে মর ইন্দাকাল-৮৪
ম্যাকলিন চাকমা/ মর কিয়োই ন' দাঘন-৮৬
রনজিত চাকমা/চাঙমা জাদর চিন-৮৭
ত্রিজিনাদ চাঙমা/ কী অদ' যার -৮৯
রাঙাবেল চাঙমা (পিইউসি)/ জীদিবং-৯০
এস্টনী চাকমা/লাঙনী তরে ইধোত উধে-৯১
চয়নিকা খীসা/এয' বেগে সমারে-৯২
প্রগতি খীসা/কী জোব দিম মুই তারে-৯৩
নূতন ধন চাকমা/চুমো তোন-৯৫

অনুবাদ কবিতা

মৃত্তিকা চাকমা/ফিলিস্তিনী কবি দারীন তাতুর কয়েকটি কবিতা-৯৬

চাকমা গান

হেমা চাকমা চন্দনা/ কোচপানার জ্বালা-১০০

বাংলা কবিতা

জড়িতা চাকমা/হিল চাদিগাঙ: আমার জন্মভূমি-১০২
নূপুরী চাকমা/পাহাড়ী-১০৩
বিজয় গিরি চাকমা/দুই দিনের সংসার না করিও অহংকার-১০৪
কোহিনুর আক্তার/কো-১০৫
সুলতান আহমেদ সোনা/শুভ হালখাতা-১০৬
কুলদীপ রায়ের দু'টি কবিতা-১০৭
বীর চাকমা/দুঃস্বপ্নের কাব্যগাঁথা-১০৯
রুপেন্দু বিকাশ চাকমা/কি পেতে কি পেলাম?-১১০
সুমিত্র চাকমা/হে প্রিয়া, তোমার প্রতীক্ষায়-১১১
প্রয়াত চিত্র মোহন চাকমার অপ্রকাশিত একটি কবিতা/স্বার্থক ধ্যান-১১২
সুবেশ চাকমা/বিশাখা-১১৩
কিকো দেওয়ান/ আত্ম পরিচয়-১১৪
রুইয়াং ম্রো/মন পাহাড়-১১৫
এস্টনী চাকমা/দীর্ঘ রজনী-১১৬

চাকমা অনুগল্প

চিজি খীসা/গায়সুয়েই গোরি-১১৭

তঞ্চঙ্গ্যা কবিতা

অজিত কুমার তঞ্চঙ্গ্যা/নারাবি ছড়া-১১৮
কে. শুদ্ধোধন তঞ্চঙ্গ্যা/"মঅনে মঅনে"-১১৯
রিপুল তঞ্চঙ্গ্যা/ গম ওক ত পইত্ত দিনুন-১২০
জবা তঞ্চঙ্গ্যা/জা বুয়ত রাইচ পদ-১২১
শোভা তঞ্চঙ্গ্যা/তঞ্চঙ্গ্যা দুগ-অ ক-অ-রা-১২২

ত্রিপুরা কবিতা

যাকোব ত্রিপুরা/মোলা তাংগ (দিন মজুর)-১২৩
মলয় কিশোর ত্রিপুরার কয়েকটি কবিতা-১২৪

মারমা কবিতা

হ্লাপ্রুসাইন মারমা (সাইন)/মাহাঃ সাংগ্রাই লাবারেই-১২৫

সুপ্রিয় তালকদার

মঙ্গোলয়েড নৃ-বংশ ও বিস্তৃতি

মঙ্গোলয়েড [Mongoloid] নৃ-বংশ বিশাল। মধ্য এশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ সমগ্র অঞ্চল তাদের অধ্যুষিত। দ্বারা উত্তর চিনের 'হান' বা 'খান' জাতিই চিনা জাতির মূল উৎস এবং চিনা জাতি এই নৃ-বংশের সর্বপ্রধান শাখা, চিন তাদের দেশ। উত্তর পূর্ব ভারত এবং বর্তমান নেপাল ও বাংলাদেশে এই নৃ-বংশের যে শাখা প্রবেশ করেছে তারা এসেছে উত্তরে তিব্বত, পূর্বে বার্মা [মায়ানমার] ও সিয়াম [থাইল্যান্ড] থেকে। কাজেই তারা ভোটচিনা [Tibeto-chinese] গোষ্টিভূক্ত ভোটবর্মি [Tibeto-Burman] শাখার মানুষ। 'হান' বা 'খান' বা মূল চিনাদের থেকে পৃথক। ভারতে ভোটবর্মি মানুষেরা 'ইন্দো-মঙ্গোলয়েড' হিসাবে পরিচিত।

ভোটবর্মিরা ভারতে আর্যদের আগমনের পূর্ব থেকেই বরাবর এসেছে। মোহেন-জো-দাড়োর কঙ্কালগুলিতেও মঙ্গোলয়েড মানুষের চিহ্ন নাকি চেনা যায়। হিমালয় পাদদেশে, আসামে ও বাংলায় তারা ছড়িয়ে পড়ে এবং বাঙালি ও অসমীয়াদের মধ্যে ব্যাপকভাবে মিশে যায়। তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী কিছুটা হয়তো বাঙালি ও অসমীয়াদের জীবনযাত্রায়, ভাষায় এবং চরিত্রেও মিশে গিয়েছে।[১] অশোক বিশ্বাস লেখেন ভোটবমি [Tibeto-Burman] ভাষার প্রভাব সবচেয়ে বেশি যাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় সম্প্রসারিত হয়েছে তারা হলো রাজবংশী, কোচ, মেচ, হাজং, চাকমা ও চট্টগ্রামি বাঙালি। তাছাড়া গারো, ত্রিপুরা ও অন্যান্য বোডো ও কুকি-চিন ভাষা থেকে কিছু কিছু শব্দ ও ভাষার অন্যান্য উপাদান বাংলায় এসেছে।[২]

ভাষাবিদগণ Sino-tibetan[Tibeto-chinese] ভাষাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। একটি হল ভোটবর্মি [Tibeto-Burman] অপরটি হল Siamese-Chinese [Thai-Chinese] চিনা ভাষাও এই সব ভাষার একই মূল ভাষা ছিল হয়তো পশ্চিম চিনের কোথাও। কিন্তু চিনা ভাষা খ্রিষ্টের জন্মের দু'হাজার বছর পূর্বে উত্তর চিনের 'হান'/'খান' শাখার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র সভ্যতার দৃষ্টান্ত হিসেবে নিজস্ব ভঙিমায় গড়ে ওঠে। ভোটবর্মি [Tibeto-

Burman] ভাষা ও অন্যান্য উপজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ও তাদের ওপর পড়েছে। খোদ চিনও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে দারুণ প্রভাবান্বিত। তিব্বত সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে।[৩] বার্মা [মায়ানমার] ও সিয়ামে [থাইল্যান্ড] বৌদ্ধধর্ম এখনো প্রধান ধর্ম। অধূনা মায়ানমার ও থাই সমাজে সিংহভাগ বৌদ্ধ। একদা প্রবল হিন্দু প্রভাব তাদের সংস্কৃতিতে ছিল, তার লক্ষণ আজো অপ্রতুল নয়।

বর্মি [মায়ানমার] রা একাদশ শতাব্দী থেকে মধ্য বার্মার [মায়ানমার] মোন [Mon] দের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভারতীয় লিপিতে তাদের ভাষা লিখছেন। থাইরা তাই [Tai] দাই[Dai] জনগোষ্টির মানুষ। তারাও 'খেমর' [Khmer] দের থেকে প্রাপ্ত ভারতীয় লিপিতেই থাই [Thai] ভাষা লিখেছেন। আকৃতিগত দিক থেকে কম্বোডিয়ার 'খেমর'[Khmer] ও বর্মি [মায়ানমার] বর্ণমালা খুবই সাদশ্যপূর্ণ। বলা এই সব লিপি বা বর্ণমালার উৎপত্তি হলো প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মীলিপি। ভাবতে অবাক লাগে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের বর্ণমালা ও এই ব্রাহ্মীলিপি হতে প্রাপ্ত চাকমা ও বর্মি [মায়ানমার] খেমর [Khmer] বর্ণমালার সাথে সাদশ্যপূর্ণ। ভাষাবিদ G.A Grierson মনে করেন ৬ষ্ট ও ৭ম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারত থেকে ভারতীয়রা মায়ানমারের দক্ষিণ-পূর্বাংশে কযেকটি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল এবং তারাই এই লিপি সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়েছিল।

গবেষকদের মতে, বস্তুত সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সম্ভবতঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রবেশ করেছিল। আজকের মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দ্বীপময় ভারত প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, সভ্যতা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাবে গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত।

মঙ্গোলয়েড পরিবারের ভাষায় অপর একটি শাখা হলো 'অস্ত্রিক' [Austric] বা প্রোটো অস্ত্রলয়ে [Proto-Australoid] এই ভাষাকে আবার দুটি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে।১.অস্ট্রো-এশিয়াটিক [Austro-Asiatic] ২.অস্ট্রোনেশিয়ান[Austranasian]। অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখা বা বংশের

মানুষ বার্মা [মায়ানমার], ইন্দোচিন ছাড়িয়ে অস্ট্রেলিয়া, পলিনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোল বা মুন্ডা প্রভৃতি জাতি এদেরই বংশধর। আর এই বংশের ভাষাগুলি ভারতবর্ষ, নিকোবর দ্বীপ, বার্মা [মায়ানমার] ইন্দোচিন [কম্বোডিয়ার 'খেমর', কোচিন-চিনের চাম] প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এই ভাষা সম্পর্কে জানা যায় অতীতে বার্মা [মায়ানমার] ও ইন্দোচিনে ভারতের এই প্রাচীন [Proto-Australoid] জাতির সাথে মঙ্গোলীয়দের [Mongoloid] র সংশ্রব ঘটে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লেখেন In Burma and Indo-China lived speakers of Austric [Austro-Asiatic] languages, who were largely of the Proto-Australoid race from India. A mixture of these Proto-Australoids with Mongolids in very early times in the Burma [Myanmar] and Indo-China is very likely, this mixture producing the ancient Rmen [Rman] or Mon people of central and Southern Burma, The Palkoungs and was of Upper Burma, as well as the Khmers, the Chams, the Stieng, the Bahnar and other Austric or Austro-Asiatic speakers of Saim [Thailand] and Indo-China" [৫] সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বর্ণনা করেন থাইল্যান্ডের দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের সাথে কোল জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে-থাই জাতের মানুষ দক্ষিণ অঞ্চলে দুটি আলাদা জাতির সংমিশ্রণে রূপ গ্রহণ করেছে-একটি মৌলিক জাতি হচ্ছে 'মোন' [Mon] আর 'খেমর' [khmers] অষ্ট্রিক বা অস্ট্রো এশিয়াটিক জাতি, কোল জাতির জ্ঞাতি নাতিদীর্ঘ শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ জাতির মানুষ এরা; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে উত্তর থেকে আগত 'থাই' [Thai] জাতির লোক-এরা মোঙ্গল জাতির মানুষ, পীতবর্ণ, চেপ্টা-নাক উঁচু চোয়াল, সরু-চোখ, চিনা বর্মি ভোটদের জ্ঞাতি। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে যে থাই জাতির মানুষ গড়ে উঠেছে তাদের চেহারা অনেকটা বাঙালি ধরনের, তবে মোঙ্গল প্রভাবটি চেহারায় একটু বেশি। উত্তর-থাইল্যান্ডের এই মোঙ্গল থাই জাতির মানুষ অপেক্ষাকৃত সুন্দর দেখতে, আর পীত বা গৌরবর্ণ থাই মেয়ে অনেক সময় দেখতে বেশ সুন্দরীই হয়[৬] ২. অস্ট্রোনেশিয়ান [Austranesian] বংশের প্রধান ভাষা হল মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার ভাষা ও বিভিন্ন উপভাষা।

স্মরণাতীত কাল হতে মঙ্গোরয়েড নৃ-বংশের মানুষ প্রাচীন ভারতভূমিতে প্রবেশ করেছিল। এদের মধ্যে দুটি বৃহৎ দলের আগমন ঘটে। একটি হলো ভোটবর্মি [Tibeto-Burman] দের শাখা Bodo এবং অপর হল সিয়াম চিনা [Siamese-Chinese/Thai-Chinese] দের শাখা Ahom/Shan. Bodo দের আগমন সম্পর্কে জানা যায় The Kacharis of Bara [mispronounced Bodo] as they call themselves, belong to the great Bodo tribe, Which is found not only in the Brahmaputra valley, but in the Garo Hills and Hills Tipperah south of the Surma valley. It is generally supposed that they are a section of the Indo-Chinese race, Whose original habit was somewhere between the upper waters of Yang-tse-kiang and Hoang-ho, and they gradually spread in successive waves of immigration over the greater part of what is now province of Assam.[৭]

উল্লেখিত বর্ণনা থেকে জানা যায় গারো ও ত্রিপুরাগণ Bodo দলভুক্ত জানগোষ্টি। বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য একটি প্রাচীন প্রদেশ। ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায় The earliest chief of Tripura tribe who successfully defended his country against the Muslim power of Bengal was recorded in Rajmala was Cheng Tung Fa..... the kingdom which the established in the region came to be known as tripura kingdom. They Assumed the little Manikya, dropped the original title Fa, and their dynasty came to be known as the Manikya dynasty[৮] ত্রিপুরারা হিন্দুধর্মালম্বী। তারা ককবরক ভাষায় কথা বলে। তাদের সংস্কৃতি খুবই বর্ণাঢ্য। অতীতে ত্রিপুরা শৌর্য-বীর্যের দেশ ছিল।

সিয়াম চিনা [Siamese-Chinese/Thai-Chinese] দলের থাই [Thai] জাতি তিনটি দলে বিভক্ত-Thai Yai, Thai Noi ও Thai ahom. Laotion ও shan রাও তাদের উপদলভুক্ত। ইতিহাস দৃষ্টে জানা

যায় ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে চিফ Suku-pha এর নেতৃত্বে অহোম [Ahom] রা আসাম অধিকার করে। তাদের আগমন সম্পর্কে সুনীতি কুমার চট্টপাধ্যায় বর্ণনা করেন। The various Tribeto-Burman groups thus came to be established on the soil of India in times of which we have no historical memory or notion, But within historical times, another Mongoloid people, this times not of Tibeto-Burman but of siamese-Chinese speech, entered into North Eastern Assam from Burman through the patkai Range and along the Noa-Dihang river.They were the Assams or Ahams[Ahoms], a people who gave their name, to the province of Assam. They advanced into Indian as a groups of invaders who established themselves in the eastern most part of the Brahmaputra valley under their chief Su-ku-pha in 1228 AD..... . The Ahoms belonged to the Thai of Shan section of the Siamese-Chinese branch of the Sino- Tibetan[৯] অহোমরা।

পাঁচশ বছর পর্যন্ত আসামে রাজত্ব করেছিল এবং নিজেদের ভাষা, লিপি, ধর্ম বজায় রেখেছিল কিন্তু ক্রমে হিন্দধর্ম অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করে অসম বা অসমীয়া জাতিতে পরিণত হয়। অবশ্য অসমীয়া ভাষা হিন্দু-আর্য বংশের ভাষা, ভোটচিনা [Tibeto-chinese] বংশের নয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতে ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয়, আসাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল রাজ্য অবস্থিত; মঙ্গোলয়েড নৃ-বংশের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার জনগোষ্ঠির আবাসভূমি। ত্রিপুরায় ত্রিপুরা, রিয়াং, চাকমা, মগ, কুকি প্রভৃতি; মিজোরামে লুসাই, পাংখুয়া, বম, লাকের, চাকমা প্রভৃতি মেঘালয়ে খাসি, গারো ও জৈন্তিয়া, খাসিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই তিনটি জনগোষ্ঠি সবাই খ্রিষ্ট্রান ধর্মাবলম্বী। আসামে অহোম/অসমীয়া, বোড়ো, খামতি, কার্বি, চাকমা চুতিয়া প্রভৃতি, মুনপুরে মেইথেই, বিষ্ণুপ্রিয়া; নাগাল্যান্ডের নাগা ও তাদের বিভিন্ন গোত্র [Clan] আঙ্গামি, আও, সেমা তাংখুল, সংতেম, লোখা, মাও প্রভৃতি, এই সব গোত্রের ভাষা বা উপভাষাগুলি এতই বিচ্ছিন্ন যে নাগারা পরস্পরের

উপভাষা বোঝেনা। তাই অসমীয়া মিশ্রিত এক নাগা ভাষা নাগাল্যান্ডে চালু করা হয়েছে তার নাম 'নাগামিজ' [Nagamese] অর্থাৎ নাগা-আসামীজ। অরুণাচল প্রদেশে ১১০টি জনগোষ্ঠি রয়েছে, তন্মধ্যে আদিরা সংখ্যাগরিষ্ট। অন্যান্য জনগোষ্ঠিরা হলো-নিশি, ওয়ানচো, মোনপা, মিশিমি, নকটে, তাগিন, তাংসা, আপা, খামতি প্রভৃতি, তদুপরি যুক্ত হয়েছে চাকমা, দেওরিও অহোম। উত্তর-পূর্ব ভারতে উল্লিখিত রাজ্যগুলি ছাড়াও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এই নৃ-বংশের অন্যান্য জনগোষ্ঠি বিক্ষিপ্ত ভাবে বসবাস করতে পারে। উত্তর-পূর্ব ভারতে অবস্থিত উল্লিখিত রাজ্যগুলোর মধ্যে মিজোরামে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে সারা ভারতে মিজোরামের স্থান দ্বিতীয়। মিজোরা তাদের কুকি চিন গোষ্ঠির ভাষা রোমান হরফে লেখে তারা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। মেঘালয়ের রাজধানী শিলং অবিভক্ত আসামের রাজধানী ছিল। শিলং স্কুল কলেজে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দানের আদর্শ পীঠস্থান। অপরুপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য শিলং শহর বিখ্যাত। এই শহরকে বলা হয় Queen of Hill Station of India আর ব্রিটিশ আমলে সাহেবেরা ডেকেছে Scotland of the Eastঃ প্রকৃতি আর মানুষ এই শহরকে সাজিয়েছে সে এক অপরুপ সাজে।

নেপাল গোর্খা [গুর্খা], নেওয়ার তামাং, শেরপা, গুরুং লেপচা, থাপা, শাক্য, লিম্বু প্রভৃতি জনগোষ্ঠির আবাসভূমি। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব আলাদা ভাষা রয়েছে যদিওবা সচরাচর তারা রাষ্ট্রীয় নেপালি ভাষায় কথা বলে। শাক্যরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তিব্বতিরাও নেপালে বসতি স্থাপন করেছে, তাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। মহামানব গৌতম বুদ্ধ এই নেপালি শাক্য বংশে লুম্বিনিতে [প্রাচীন ভারত] জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। শাক্যরা ব্যতীত অন্যান্য জনগোষ্ঠি সবাই হিন্দু-ধর্মাবলম্বী। উল্লেখ্য যে সারা বিশ্বে নেপাল একটি মাত্র হিন্দু রাষ্ট্র।

বাংলাদেশে, রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান [পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল] কক্সবাজার, সিলেট, বরিশাল, পটুয়াখালি, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা প্রভৃতি এবং উত্তর-পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলায় মঙ্গোলয়েড নৃ-বংশের বিভিন্ন শাখার জনবসতি রয়েছে। কক্সবাজার জেলা মূলতঃ রাখাইন অধ্যুষিত অঞ্চল, তবে জেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে দৈনাক/তঞ্চঙ্গ্যা [চাকমাদের একটি উপদল] রা সুদীর্ঘকাল হতে বসবাস করে আসছে। রাখাইনরা রাখাইন ভাষায়

[আরাকানি] কথা বলে এবং মায়ানমা হরফে নিজেদের ভাষা লিখে। প্রকৃতপক্ষে রাখাইন ও বর্মি [Burman] রা একই জাতিভূক্ত। তারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। অবিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম [রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি,বান্দরবান] জেলার উত্তরে উত্তর পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও উত্তর-পূর্বে মিজোরাম রাজ্য এবং দক্ষিণে মায়ানমার রাখাইন রাজ্য [আরাকান] অবস্থিত বিধায় এই জেলা একটি প্রান্তিক জেলা। এই জেলা মঙ্গোলয়েড-নৃ বংশ বা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুত এগারটি জনগোষ্ঠি সুদুর অতীতকাল হতে বসবাস করে আসছে। তারা হলো চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, লুসাই, পাংখোয়া, বম, খুমি, খ্যাং ও ম্রো। তাদের নিজেদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে যেগুলো পারস্পরিক সাদশ্যপূর্ণ তবে কিছুটা ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাপিডিয়াতে লেখা হয়েছে চাকমা ভাষায় চিনা ভাষার মতো টান [Tone] আছে, তবে তা প্রকট নয়। চাকমা ও মারমাদের ঐতিহ্যবাহী বর্ণমালাও রয়েছে। তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ; শিক্ষা, রাজনীতি, চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা অগ্রগামী। এই ১১ টি জনগোষ্ঠি ব্যতীত কিছুসংখ্যক আসাম/অসমীয়া ও নেপালি জাতিভূক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এতদ অঞ্চলে বসতি রয়েছে। সিলেট জেলায় মনিপুরী, খাসি ও জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠির বাস। তারা হয়তো পূর্বে উত্তর-পূর্ব ভারতের মনিপুর ও মেঘালয় রাজ্য থেকে এসে সিলেটে বসতি গড়েছিল কারণ অতীতে সিলেট আসামের অংশ ছিল। বরিশালে ও পটুয়াখালী জেলায় বসবাসরত রাখাইনরাও কক্সবাজার জেলায় রাখাইনরা একই জনগোষ্ঠি। তারা মূলতঃ মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে [আরাকান] থেকে এসেছে। অবিভক্ত ময়মনসিংহ জেলার বিরিশিরি, মধুপুর, হালুয়া ঘাট প্রভৃতি স্থানে গারো সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। তাদের ভাষা ত্রিপুরা ভাষার সাথে সাদশ্যপূর্ণ যেহেতু উভয় ভাষা বোডো পরিবারভুক্ত। গারোরা খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। তাদের অধিকাংশ লোক উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয় রাজ্যে অবস্থিত গারো পাহাড়ে [Garo Hills] বসবাস করে। উত্তর পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী রাজবংশী, কোচ প্রভৃতি সম্প্রদায় নিজেদের ভাষায় কথা বলতো এবং তারা দীর্ঘকাল ধরে নিজেদের ভাষা ধরে রেখেছিল কিন্তু ক্রমে বাংলাভাষী মানুষের সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষার প্রবল প্রভাবে নিজেদের ভাষা ভুলে গিয়ে বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে, তাছাড়া অনেকেই হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বাঙালি হয়ে গেছে, তবে

চেহারায় মঙ্গোলীয় ছাপ সুস্পষ্ট। উত্তর-পূর্ববঙ্গের জেলাগুলোতে এইরুপ মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ভারতকে বলা হয়েছে Museum of Races'। ভারতে ১৫ টি প্রধান ভাষা এবং প্রায় ৯০০টি আঞ্চলিক বা উপভাষা রয়েছে। ইতোমধ্যে হয়তো ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে ভাষার সংখ্যা বৃদ্ধিও পেয়েছে। ভারত আর্য, অনার্য, দ্রাবির, মঙ্গোলীয় ও অন্যান্য বিভিন্ন সংকর জাতির দেশ। মঙ্গোলয়েড নৃ-বংশের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠি উত্তর-পূর্ব ভারত এবং বর্তমান বাংলাদেশ ও নেপালে প্রবেশ করেছিল, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উল্লেখ করা হলো। অপরদিকে গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পূর্বে আনুমানিক ৬ষ্ঠ শতাব্দী হতে শাক্যবংশীয় বৌদ্ধরা ভারত থেকে বিতারিত হতে শুরু হলে উত্তরে তিব্বত, নেপাল পূর্বদিকে আসাম হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রবেশ করেছিল বলে ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তর-পূর্ব ভারত হতে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুরে শাক্যবংশীয় জনগোষ্ঠি এবং মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুত বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, দল,উপদল বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সংস্কৃতি আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক মিলনক্ষেত্র গড়েছিল তাই এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুরে বসবাসরত জাতি, উপজাতি, সম্প্রদায় আদিবাসীর সাংস্কৃতিক পটভূমি, জীবনযাত্রার প্রণালী, কৃষিপদ্ধতি, আচার-আচরণ,সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস খাদ্যভ্যাস আপাততঃ দৃষ্টিতে কিছুটা ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও মূলত: এক ও অভিন্ন। নৃ-বিজ্ঞান মতে বর্তমানে কোনো জাতি বা গোষ্ঠি তার জাতিগত বিশুদ্ধতা [Racial Purity] দাবি করতে পারে না। পৃথিবীর মানব জাতির মধ্যে কোন না কোন ভাবে রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে ঐতিহাসিক কারণে।

শুরুতে বলা হয়েছে মধ্য এশিয়ায় মঙ্গোলয়েড নৃ-বংশের 'হান' বা 'খান' জাতিই চিনা জাতির মূল উৎস। কাজেই পরবর্তীতে তারা বিভক্ত হলেও তাদের শিকড় [Root] এক ও অভিন্ন। মঙ্গোলিয়ার প্রধান শাসক তেমুজিন [Temujin] তার বীরত্বের জন্য চেঙ্গিস খান [Genghis khan] নামে পরিচিতি লাভ করেন যার অর্থ 'Golden lineage'। ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায় চেঙ্গিস খানের দৌহিত্র কুবলাই খান '[kublai Khan]' বিশ্বে সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য শাসন করেন। যাহোক, চেঙ্গিস খানের বংশধরেরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল যাদের অস্তিত্ব আজো মঙ্গোলিয়া, চিন, ভারত, রাশিয়া,

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য,উজবেকিস্তান, তুর্কমেকিস্তান,তাজিকিস্তান, কাজাখাস্তান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে রয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকা নিবাসী একজন চাকমা মহিলা খেয়ালবশতঃ ডি.এন.এ টেস্ট করে জানতে পেরেছেন যে তিনি চেঙ্গিস খানের বংশধর। কাজাখাস্তানের মুদ্রা [Currency] র নাম হচ্ছে Tange। প্রতীয়মান হয় যে এই শব্দ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত মারমা জনগোষ্ঠি টাকাকে 'তেংগা' এবং চাকমা জনগোষ্ঠি 'তেঙা' বলে, এই দু'টি দৃষ্টান্তই চমকপ্রদ। একই নৃ-বংশের মানুষ পরস্পরের কাছ থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে বিচ্ছিন্ন হলেও অবিচ্ছিন্ন টানে আজো এইরুপ কিছু কিছু দৃষ্টান্ত কখনো কখনো গোচরীভূত হয় যা রীতিমত বিস্ময়কর।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি:

১. গোপাল হালদার, *ভারতের ভাষা*, কলকাতা, ১৯৯৩ পৃঃ ২৪।

২. অশোক বিশ্বাস, *বাংলা ভাষায় ভোট-বর্মী ভাষার প্রভাব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা,২০০৮ পৃঃ ৫।

৩. গোপাল হালদার, *ভারতের ভাষা*, কলকাতা, ১৯৯৩ পৃঃ ২৫।

৪.G.A Grierson, *Linguistic Survey of India*. Vol.v. part11,calcutta,1903P321.

৫. সুনীতি কুমার চট্টপাধ্যায়, *রবীন্দ্র সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ* [প্রথম সংস্করণ কলকাতা ১৯৪০ পৃঃ ৫১৩।

৬. suniti kumar chatterji, *kirata-jana-krti,* calcutta, 1951.P20-22.

৭. BC. Allen, *Assam District gazetteer*, Vol.vi calcutta, 1905. P.31.

৮. Gan Chawduri, *Tripura Land and its people*, calcutta, P14.

৯. suniti kumar chatterji, *kirata-jana-krti, calcutta,* 1951.P51-102.

পরিচিতি : সুপ্রিয় তালুকদার, প্রাক্তন পরিচালক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট (বর্তমান ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট), রাঙ্গামাটি।

পরিমল চাকমা

মিজোরামের চাকমাদের সম্পর্কে কিছুকথা।

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্বে সীমানায় ভারতের মিজোরাম রাজ্য। মিজোরামের ১০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ চাকমা জন জাতির বসবাস। ২০১১ সালের গননায় মিজোরামে চাকমা জনসংখ্যা ছিল ৯৬, ৮৭২ জন। বর্তমান ২০১৯ সালে ১ লক্ষের উপরে হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাস রত চাকমারা মিজোরামের চাকমাদের সম্পর্কে খুব কমই জানে। মিজোরামের চাকমাদের সম্পর্কে একটা সাধারন ধারনা দেওয়ার জন্য আজ আমার এই লেখা ঃ

মিজোরামের ৮ জেলার মধ্যে চাকমারা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মামিট, লুংলেই ও লংতলাই জেলায় বসবাস করে থাকে। বাংলাদেশের চাকমারা মিজারামের চাকমা বলতে 'ঠেগাকুল্যে' বলতো। আসলে তারা শুধু ঠেগা নয়, ঠেগা, তোইজং, হরিণা ও সাজেক উপনদীর তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করে থাকে। ১৯৭২ সালে ভারত সরকার মিজোরামের দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চলে বসবাসকারী চাকমাদের নিয়ে চাকমা স্বায়ত্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করে। যাকে সংক্ষেপে সিএডিসি (CADC) বলে। কমলানগর হলো সিএডিসির প্রধান কার্যালয়। এই জেলা পরিষদ ২৪ সদস্য বিশিষ্ট। এদের মধ্যে ২০ জন সদস্য নির্বাচিত এবং ৪ জন মনোনিত। পরিষদ প্রধান হলেন চিফ এক্িমকিটিভ মেমবার। CEM। পরিষদ রাজ্য গভর্নরের নিকট দায়ী। জেলা পরিষদের অধিনে ২৭ টি বিভাগ আছে এবং ৭৭ টি ভিলেজ কাউন্সিল আছে। মিজোরামের চাকমারা এতে পরাপরি সন্তুষ্ট নয়। কারন চাকমাদের মাত্র অর্ধেক জনসংখ্যা সিএডিসি ভিতরে বসবাস করে। ২০১১ সালের গননা অনুযায়ী ৪৩৫২৮ জন চাকমা সিএডিসিতে বাস করে। বাকী অর্ধেকের বেশী চাকমা সিএডিসির বাহিরে। হরিণা ও সাজেকের চাকমারা সম্পূর্ণ সিএডিসির বাহিরে। যেখানে মিজোরামের গড় শিক্ষার হার ৯১.৫৮ % সেখানে চাকমাদের শিক্ষার হার মাত্র ৪৫%। চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চল গুলি এখনো মিজোরামের সবচেয়ে অনুন্নত রয়েগেছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট সব দিক দিয়ে। সিএডিসি উন্নয়নের বরাদ্দ পায় মিজোরামের রাজ্য সরকার থেকে। মিজোরাম রাজ্য সরকার মিজোদেরই প্রাধান্য, তাই চাকমা অন্চল

গুলি অবহেলিতই রয়ে যায়। প্রাদেশিক পরিষদে মাত্র দু'জন চাকমা এম পি থাকে। তাই মিজোরামের চাকমাদের দাবী জেলা পরিষদের পরিবর্তে সকল চাকমা অঞ্চল মিলে ইউনিয়ন টেরিটোরিতে উন্নিত করা হোক এবং সকল উন্নয়নের বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে হোক।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ

মিজোরামে চাকমা বসতি।

মিজোরামে চাকমা বসতি ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে তার কোন লিখিত রেকর্ড নেই। ব্রিটিশ রেকর্ডে যা আছে তাই তুলে ধরবো। তবে মিজোদের বা চাকমা কথায় কুকিদের সাথে চাকমাদের সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের। মিয়ানমার থাকা সময়ে ও চিনরা (চাকমাদের ভাষায় কুকিরা) চাকমাদের প্রতিবেশী ছিল। দুই গোষ্ঠীই মিয়ানমার হয়ে বর্তমান অবস্থানে এসেছে। আর বর্তমান অবস্থার জন্য ব্রিটিশরা অনেকাংশে দায়ী। এক সময় চাকমা ক্ষমতাশালী দেওয়ানরা মিজো বা কুকি দলপতিদের (চিফ) সাথে বন্ধুত্ব করতো এবং তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে কুকিদের লেলিয়ে দিত। বাবু কামিনী দেওয়ানের আত্মজীবনী বই, এক দীন সেবকের জীবন কাহিনীতে তা উল্লেখ আছে। তবে দূর্দষ মিজোরা মাঝে মধ্যে চাকমা গ্রামও আক্রমন করতো। জনশ্রুতি আছে কুকি আক্রমনে চাকমাদের কামবে গজার একটা গোষ্ঠী (কালাকাঙারা) এত হতাহত হয়েছিল যে তাদের জন সংখ্যা এখনো খুব কম। ব্রিটিশ দের, 'কর বাড়াও' নীতির ফলে অষ্টাদশ শতকে চাকমারা চট্টগ্রামের সমতল ভূমি (রাংগুনিয়া, রাউযান, ফটিকছড়ি থেকে উৎখাদ হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে বসতি করতে বাধ্য হয়। ক্রমে উবর জুম ভূমি খোঁজে তারা পূর্ব ও উত্তর দিকে ছড়িয়ে পরে। চাকমা রাণী কালান্দীর বার বার তাগিদে এবং ইংরেজ শিশু কন্যা মেরি উইনচষ্টার কে অপহরের ফলে ১৮৭১-৭২ সালে ব্রিটিশ লুসাইদের বিরুদ্ধে দমন অভিযান পরিচালনা করে। সে সময় চাকমা রাণী ৫০০ চাকমা কুলি দিয়ে ব্রিটিশ কে সহায়তা করে। তাদের কিছু অংশ প্রথম মিজোরামে বসতি শুরু করে। ১৮৯০ মিজোরাম পুরাপুরি ব্রিটিশ দখলে এলে অস্থায়ী অনুমতি নিয়ে আরো কিছু চাকমা মিজোরামে বসতি শুরু করে। দীর্ঘ দিন দক্ষিন লুসাই হিল চট্টগ্রাম প্রশাসনের অধিনে ছিল। এই সময় বহু চাকমা ঠেগা এবং তোইজং অঞ্চলে বসতি শুরু করে যদিও ব্রিটিশ শাসকরা লুসাই হিলে নতুন বসতি নিয়ন্ত্রণ করতো। এছাড়াও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় British Transporঃ Agency তে বহু চাকমা চাকরি

করতো। দেমাগ্রীতে তাদের কেন্দ্র। এদের কিছু অংশ সেখানেই বসতি করেছে। তারপর কিছু চাকমা মিজেরামে বসতি করেছে বড় পরঙের সময় ১৯৬৩-৬৪ সালে।

মিজোরামে নতুন বসতি যে শুধু চাকমারা করেছে তা নয়। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের চিন হিল থেকেও বহু মিজো গোষ্ঠীর লোকজন মিজোরামে বসতি করছে। সাজেকে তো লুসাই পাংকুয়া প্রায় নেই। মিজো গোষ্ঠীর লোক হলে মিজোদের কোন আপত্তি নেই। শুধু আপত্তি চাকমাদের বেলায়।

তৃতীয় পর্ব ঃ

চাকমা মিজো বিবাদের কারনঃ

মিজোরামে চাকমা ছাড়াও আরো দুটি, মারা ও লাই স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ আছে। কিন্তু মিজোদের যত আপত্তি ও বিবাদ চাকমাদের নিয়ে। কিন্তু কেন? মিজো চাকমাদের বিবাদের কারনের পিছনে অনেক কারন ও কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা আছে। সেগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

১. ১৮৭১-৭২ সালে ব্রিটিশের লুসাই দমন অভিযানে চাকমা রাণী কালিন্দী ব্রিটিশদের সাহার্য করেছিলেন। সে সময় রাণী ৫০০ জন চাকমা কুলি দিয়েছিলেন দমন অভিযানে নিয়োজিত বাহিনীকে সহায়তা দেওয়ার জন্য।

২. ১৯০০ শতকে উত্তর ও দক্ষিন লুসাই হিল একত্র করার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু অংশ লুসাই হিল জেলার সংগে সংযুক্ত করা হয় যেখানে চাকমা বসতি ছিল।

৩. ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় Transport Corps এ কমব্রত অনেক চাকমা যুদ্ধের পরে দেশে না এসে লুসাই হিলে বসতি শুরু করে।

৪. লুসাই হিলে চাকমা বসতি শুরু হয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ থেকে অস্থায়ী অনুমতি নিয়ে। ১৯৩৩ সালে জৈনক দেবি চরন দেওয়ান ১৫ পরিবার চাকমা বসবাসের অনুমতি নিয়েছিলেন। এই ভাবে ব্রিটিশ কতৃপক্ষের অনমতি নিয়ে চাকমা বসতি বৃদ্ধি পায়।

৫. ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাধের ফলে অনেক চাকমা কর্ণফুলী নদী পার হয়ে মিজোরামে চলে যায়।

৬. চাকমাদের জেলা পরিষদ থেকে ইউনিয়ন টেরিটোরিতে উন্নীত করার অথবা সকল চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চল সিএডিসি অধিনে নিয়ে আসার দাবী দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

৭.মিজোদের দাবী মিজোরামে শুধু মিজোজাতি গোষ্ঠী লোকেরা আদিবাসী (Indigenous). চাকমা, ব্রুরা নয়। চাকমাদের দাবী সব এসটি ভুক্ত জনগণ মিজোরামের আদিবাসী।

৮. চাকমা দুলিয়েন (মিজো)ভাষা জানেনা বিধায় কোন সরকারী চাকুরি পায় না।

৯. মিজোদের এমএনএফ আন্দোলন চাকমারা সমর্থন করেনি।

১০. ১৯৭৭-৮০ সালে ভারত সরকার শান্তিবাহিনী দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে মিজো বাহিনীকে পুরাপুরি বিতারিত করে। মিজো বাহিনী তখন মিয়ানমারের জংগলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

১১. মিজোরামে আদিবাসীরা সবাই ক্রীষ্টান, হিন্দু ব্রুরাও ক্রীষ্টান হতে শুরু করেছে। কিন্তু চাকমা তঞ্চঙ্গ্যারা গোঁড়া থেরবাদী বুদ্ধিষ্ট।

১২. মিজোরা চাকমাদের সাথে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগের ভাগাভাগি করতে রাজী নয়। সম্প্রতি কালে মিজোরা চার চাকমা ছাত্র যারা সর্ব ভারতীয় এমবিবিএস পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করেছে তাদেরকে আসন বরাদ্দ দেয় নাই।

চতুর্থ পর্ব ঃ

মিজোরামে চাকমাদের রাজনীতি ও জীবন

মিজোরামে চাকমাদের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক দল নেই। এতদিন পর্যন্ত চাকমারা হয় কংগ্রেস (Indian National Congress) নতুবা প্রাদেশিক দল মিজো নেশনেল ফ্রন্ট (MNF)এর সংগে জড়িত ছিলেন। তাদের চাকুরী এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও উন্নয়ন বরাদ্দ নিয়ে দরকষাকষি করার মত কোন লোক ছিলনা বা উপায় ছিল না। প্রায় সময়ই বৈষম্যের শিকার হতো। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারতীয় চাকমারা কংগ্রেসের প্রতি একান্ত অনুগত ছিল। প্রখ্যাত সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের ভাষায়, চাকমারা সবসময় ভারতের প্রতি অনুগত উপজাতি হিসাবে ছিল এবং আছে। কংগ্রেস সরকার সেই হিসাবে চাকমাদের উপর সুবিচার করেনি এক ১৯৭২ সালে চাকমা স্বায়ত্ত শাসিত জেলা পরিষদ দেওয়া ছাড়া। মিজোরামের চাকমাদের মিজো এবং মিজো প্রাদেশিক সরকারের পদে পদে বৈষম্যের শিকার হতে হয়। দুলিয়েন বা মিজো ভাষা না জানার অজুহাতে

চাকমাদের প্রাদেশিক কোন চাকুরীতে নিযুক্তি দেয় না। মিজো ছাত্র সংগঠন মিজো জিরলাই পল (গতচ) উগ্র মিজো জাতীয়তা বাদী সংগঠন। তাদের দাবী চাকমারা মিজোরামের আদিবাসী নয়, বহিরাগত। তারা চাকমাদের সংগে কোন কিছু শেয়ার বা ভাগাভাগি তে রাজী নয়। মিজোরাম শুধু মিজোদের জন্য। তারা চাকমাদের মিজোরাম থেকে বের করে দিতে চায়। তারা মিজো জাতিভুক্ত নয় বলে ব্রুদের (রিয়াং)অনেককে অত্যাচার করে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

মিজোরামে চাকমাদের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক দল না থাকলে ও চাকমারা ও বসে নেই। এখন শিক্ষিত চাকমা যুবকরা প্রতিষ্ঠা করেছে অরাজনৈতিক সংগঠন Young Chakma Association(YCA)। তারা চাকমা ভাষা, সংস্কৃতি, সেবা ও উন্নয়নের উপর কাজ শুরু করেছে। পিছিয়ে পরা চাকমাদের উন্নয়নের জন্য সচেতন করে তুলছে। CADC এর রাজধানী চংতেই বা কমলানগর। এখানে ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কমলানগরকে কেন্দ্র করে মিজোরামের চাকমারা উন্নয়নের পরিকল্পনা ও স্বপ্ন দেখছে। সিএডিসি অঞ্চলে চাকমাদের নিজস্ব ভাষায় ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান শুরু করেছে। মিজোরামের চাকমারা ধীরে ধীরে উন্নতি করছে। এখন তারা দিল্লী কলকাতা ছাড়াও, সিলং, গৌহাতি, শিলচরের কলেজ, ইউনিভারসিটিতে পড়ে। এই ত সেদিন সাজেকের মেয়ে মনিকা আসামের শিলচর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণ পদক পেয়ে এম এ পাস করেছে।

এরিমধ্যে মিজোরামের চাকমাদের রাজনৈতিক অংগনে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়েছে। ২০১৮ সালে এক কালে মিজোরামের মন্ত্রী সভার সদস্য চাকমা নেতা বাবু নিরুপম চাকমা অনেক দিনের পুরানোদল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগাদান করেছেন। মিজোরামের আরেক মন্ত্রী বাবু বুদ্ধ ধন চাকমা মিজোরামের কংগ্রেস মন্ত্রী সভা থেকে পদত্যাগ করছেন এবং গত ফেব্রুয়ারি ১৯ নির্বাচনে বিজেপি দল থেকে দাঁড়িয়ে জিতেছেন। তিনিই মিজোরামে প্রথম বিজেপি সংসদ সদস্য। শোনা যায় বাবু নিরুপম মিজোরামের লোকসভার একমাত্র আসনে বিজেপি প্রার্থী হবেন। বাবু নিরুপম চাকমা সর্বভারতীয় চাকমা সংগঠন, Chakma National Council of India(CNCI) এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। যদিও সিএডিসির ইসিএম (ECM) বাবু রসিক মোহন চাকমা এমএনএফ দলের। এবার সিএডিসি নির্বাচনে বিজেপি ২০ আসনের মধ্যে ৫ আসনে জয়ী

হয়েছে। এদিকে ত্রিপুরার দুজন চাকমা এমপিই(MLA) বিজেপি দল থেকে নির্বাচিত। মিজোরাম সহ ভারতীয় চাকমারা পুরানো মিত্র (কংগ্রেস) ছেড়ে বিজেপি দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

এতে বুঝা যায় বর্তমানে ভারতের চাকমারা নিজেদের সুবিধা আদায়ে এখন বিজেপির সহযোগিতা ও আশীর্বাদ কামনা করে। তবে। ভালমন্দ ফলাফল দেখার জন্য আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

পরিচিতি : কর্নেল পরিমল চাকমা, অবসর প্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, ঢাকা।

ধীর কুমার চাকমা

অতীত,বর্তমান ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের হিল চাদিগাঙ

ভূমিকা:

অতীত আর বর্তমানকে নিয়েই ভবিষ্যৎ। এক সময় এসব নিয়ে মানুষ খুব একটা ভাবেনি। প্রকৃতির খেয়াল-খুশী মাপিক যখন যা ঘটেছে, তা মানুষ নীরবে মাথা পেতে নিয়েছে। কার্যকারণ সম্পর্কে মানুষের কোন কৌতুহলও জাগেনি। অধুনা কিন্তু পৃথিবীর কোন কিছুই মানুষের নজর এড়াতে পারে না। সব কিছুই মানুষের নখ দর্পণে। মানব সমাজ বিকাশের এক পর্যায়ে প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষ, হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় আয়ত্ব করতে হয়েছে টিকে থাকার অভিনব কায়দা-কৌশল। অতীতের সে সবই এখন ইতিহাস; যার কাছ থেকে সম্যক ধারণা নিয়ে মানুষ আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছে। সে যাই হোক,এখন ইতিহাস পর্যালোচনা নয়। বিষয়টা হচ্ছে, ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রসঙ্গক্রমে তার অতীত ও বর্তমানের দিকে কিছুটা আলোকপাত করা। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সমগ্র দেশের এক দশমাংশ জায়গা জুড়ে দশ ভিন্ন ভাষাভাষী ১৩টির অধিক আদিবাসী জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর আবাসভূমি, পার্বত্য চট্টগ্রাম। ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলকে নিয়ে জেলা ঘোষণার পর "পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা" নামকরণ হয়। আর তখন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বলা হয় ''চিটাগং হিল ট্রেক্টটস্'' বা চলতি ভাষায় "হিল চাদিগাঙ"। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদদৌল্লার পরাজয়ের পর বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। শুরু হয় ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামল। '৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়। জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়ে ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করে। তখন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্যাকাশ কালো মেঘাচ্ছন্ন হয়। ব্রিটিশ-ভারতে সব জুম্মরা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি বাসিন্দা তথা এক মায়ের সন্তানের মত। প্রথমতঃ দেশ বিভাগ, দ্বিতীয়ত কাপ্তাই বাঁধের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কালের বিবর্তনে আজকে তারা উত্তরকূল্যা, দেজকূল্যা আর দক্ষিণকুল্যা হিসেবে (ভারত-বাংলাদেশ-বার্মা) তিন প্রতিবেশী রাজ্যের

অধিবাসী। পাকিস্তান শাসনামল থেকে আজকে (১৯৪৭-২০১৯) বাংলাদেশ শাসনামল পর্যন্ত দীর্ঘ ৭২ বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের পুঞ্জিভূত সমস্যার পরিণতি হচ্ছে আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংকট; যা পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। এই সংকট নিরসন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষে জাতিধর্ম বর্ণ ও দলমত নির্বিশেষে বিশ্বের সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা অনস্বীকার্য।

এক নজরে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক প্রেক্ষাপট ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে এক সময় স্বাধীন রাজার আমল ছিল। "১৭২৪ সালে চাকমা রাজ্য মোগলদের দ্বারা আক্রান্ত হলে চাকমা রাজা দলবলসহ রোসাঙ্গ রাজ্যে পশ্চাৎপচরণ করেছিলেন। রোসাঙ্গ (আরকান) রাজ তাঁকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। কিছুদিন পর তিনি চাকমা রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। অতীতে চাকমা রাজ্যে বহু সংখ্যক সংখ্যালঘু আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বাস ছিল।তাদের মধ্যে চাকমা, রিয়াং, ত্রিপুরা ও মারমা ইত্যাদি জাতিসমূহ ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ধর্মীয় দিক দিয়ে চাকমা এবং ত্রিপুরাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। ত্রিপুরারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী আর চাকমারা হলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এই ধর্মীয় বিভেদ থাকা *সত্ত্বেও চাকমাদের সাথে* ত্রিপুরাদের কোন সময়েই সম্পর্কের অবনতি হয় নাই। চাকমাদের সাথে ত্রিপুরাদের সু-সম্পর্ক বর্ণনা প্রসঙ্গে মিঃ জে.পি.মিলস্ লিখেছেন, In every way their (the tripuras) material culture appears to be identical with that of the Chakma." অতীতে মারমাদের সাথে চাকমাদের সম্পর্কও ত্রিপুরাদের মতো যথেষ্ট হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল।" [সূত্রঃ পৃষ্ঠা ১৪, ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে চাকমা জাতির প্রতিরোধ সংগ্রাম (১৭৭২-১৭৯৮), লেখক-অধ্যাপক, ড.সুনীতি ভূষণ কানুনগো]। মং সার্কেল রাজবাড়ীর সাথে রাঙ্গামাটির চাকমা রাজবাড়ীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মং রাণীর নাম রাণী নীহার বালা রায়, বাবা নলিনাক্ষ রায়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তারা উভয়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাদের মধ্যেকার মেলামেশা বর্তমানেও ঘনিষ্ট পর্যায়ে। চাকমা পাড়া ও মারমা পাড়া পারস্পরিক সংলগ্ন এলাকায় হওয়াতে পরস্পরের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও চেহারা না দেখে এমনি কথার মধ্য দিয়ে চাকমা, মারমা চেনাই যায়না। দেশ বিভাগের সময় সকল জুম্মরা ভারত, বার্মা ও বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ছড়িয়ে পড়ে।

মোঘল ও ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল প্রায়ই একটা যুদ্ধ ক্ষেত্রের মতো। ১৮৬০ সালের আগে চট্টগ্রাম অঞ্চলটি কখনো ত্রিপুরা মহারাজা, কখনো আরাকান রাজা, কখনো মোঘলদের অধীনে ছিল। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের আগমন ঘটেছে ১৪১৮ সালে। চাকমা রাজার প্রথম বসতি হয় কদমতলী (বান্দরবন), তারপর রাঙ্গুনিয়ায়। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা জেলা করার পর চন্দ্রঘোণাতে জেলা সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সদর দপ্তর চন্দ্রঘোণা থেকে রাঙ্গামাটিতে স্থান্তরিত হলে ব্রিটিশ সরকারের পরামর্শে চাকমা রাজ দফতর রাজানগর থেকে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর হয়। উল্লেখ্য, ১৮৬৯ সালের ১ জানুয়ারী চন্দ্রঘোনা থেকে রাঙ্গামাটিতে জেলা সদর দফতর স্থানান্তরিত হয়। [সূত্রঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ইতিকথা-শরবিন্দু শেখর চাকমা]। মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৪১৮ সালে চাকমা রাজার শাসনকাল শুরু হয়। তার আগে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল ত্রিপুরা মহারাজার শাসিত রাজ্য। ''সপ্তদশ শতকে অর্থাৎ ১৬৬৬ খ্রীঃ আওরঙ্গজেবের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম মোঘল অধিকারে আসে। ১৬৭০ সালের ১৫ অক্টোবর বাংলার নবাব মির কাশিম পার্বত্য চট্টগ্রামসহ পুরো চট্টগ্রামের শাসনভার ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে তুলে দেন। তবে মোগল ও ইংরেজ শাসন নীরবে চাকমারা মেনে নেয়নি। রাজা জানবক্স খাঁর নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে (১৭৭২) যুদ্ধ শুরু হয়। বেশ কয়েক দফা (সম্মুখ যুদ্ধ বাদেও গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে) যুদ্ধে জয়লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত ১৭৮৫ সালে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আর চাকমাদের সাথে সমজোতা চুক্তি হয়। তারপরে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ শাসন পুরোপুরি কায়েম হয়।

১৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে চাকমা সার্কেল, মং সার্কেল ও বোমাং সার্কেল –এই তিন সার্কেলে বিভক্ত করে। পরবর্তীতে প্রত্যেকটি সার্কেলে জনসংখ্যানুপাতে মৌজায় বিভক্ত করে দেয়া হয়। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৮৮১ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ অ্যাক্ট, ১৮৮১' চালু করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের সমন্বয়ে স্বতন্ত্র স্থানীয় পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা হয়। ১৯০০ সালের ১ মে ব্রিটিশ সরকার বহুল পরিচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০ (Chittagong Hill Tracts Regulation ১৯০০ অপঃ) জারী

করে। ১৯০০ সালের ১৭ মে কলকাতা গেজেটে এটি প্রকাশ করা হয়। এই আইন কার্যকর হওয়ার পরও বহুবার সংশোধন করা হয়েছিল। ১৯০০ সালের আইন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছিল। তাই এই আইনের অন্তর্নিহিত কতিপয় ধারা জুম্মদের জন্য চরম অবমাননাকর ও প্রতিক্রিয়াশীল হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নেতৃবৃন্দ কিন্তু ওই এলাকার ভূমিতে তাদের অধিকারসহ জুম্ম জাতিগোষ্ঠীগুলোর সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে ১৯০০ সালের শাসনবিধিকে রক্ষা কবচ হিসেবে মনে করতো। কারণ ১৯০০ সালের আইন সংশোধন এবং পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে সমতলের জাতীয় সংগ্রামের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হলেও এই আইন পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-উপজাতীয়দের (বাঙালি) অভিবাসনের প্রবল স্রোতকে বহুলাংশে রোধ করতে সক্ষম হয়েছিল।" (সূত্রঃ জুম পাহাড়ে শান্তির ঝরনাধারা-ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি, পৃঃ ২৫, পৃঃ ২৬,পৃঃ২৭)। তাই পাকিস্তানামল এবং আজকে বাংলাদেশ আমলের মতো করে ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত সেটেলার বাঙালি অনুপ্রবেশ অবাধে ঘটতে পারেনি।

জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের গতিধারা ঃ

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগষ্ট উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়। দেশ বিভাগের আগেই (পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজাসহ) উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা অমুসলমান বিধায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা চালান। তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতির নেতা স্নেহ কুমার চাকমা ও কামিনী মোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মহাত্মাগান্ধী, আচার্য কৃপালিনী, সর্দার বল্লভ ভাই পেটেল ও কংগ্রেস সভাপতি ড.রাজেন্দ্রসহ প্রমূখ কংগ্রেস নেতৃবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করে ভারতে তাদের অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে আলোচনা করেন। কিন্তু র‍্যাডক্লিব কমিশন পাহাড়ীদের এই দাবী মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত করে। ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের পর ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে নিজেদের অন্তর্ভূক্তির প্রশ্নে অমুসলিম উপজাতীয়দের মধ্যে সৃষ্ট দ্বিধাগ্রস্থ মনোভাবের কারণে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর মনে তাদের (উপজাতীয়দের) বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা পরায়ণ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ শাসকরা যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিলেন, তারই জের হিসেবে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর তাদের একতরফা জবরদস্তিমূলক সিদ্ধান্তসমূহ চাপিয়ে দিতে থাকে। পক্ষান্তরে ১৯০০ সালের শাসন বিধির আড়ালে দেশের অবশিষ্ট অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণের মধ্যে একদিকে আত্মমূখীন মনোভাব, অন্য দিকে এক ধরণের এলিনিয়েশন বা বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি হয়। (সূত্রঃ জুম পাহাড়ে শান্তির ঝরণা ধারা-ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-পৃষ্ঠা ২৫)। শুরুতে নানারকম বৈষম্য নিয়ে এভাবে পাকিস্তানে জুম্মদের নাগরিক জীবনের সূত্রপাত হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দু'দশকাধিককাল ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের বিমাতাসূলভ রাজনৈতিক যুগের অবসান ঘটে; ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তাক্ত স্বাধীনতার যুদ্ধের মাধ্যমে। স্বাধীন রাজার আমল থেকে রাঙ্গামাটি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের কেন্দ্র বিন্দু ও প্রাচীন শহর। '৭১-এর মুক্তি যুদ্ধের সময় পাক সেনারা সর্বপ্রথমে চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি শহরের দখল নেয়। তখনকার পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে 'জুম পাহাড়ে শান্তির ঝরণাধারা' বই-এ উল্লেখ করা হয় যে,-"তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি এমনই উভয় সংকটাপন্ন ছিল যে, পাকিস্তানী দালালদের চাপের মুখে উপজাতীয় সমাজপতিরা মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন না করে পাকিস্তানকে সমর্থন করতে বাধ্য হন। এপ্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা হয় যে, দ্বিজাতি তত্ত্বের বিশ্বাসী পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পাহাড়ী জনগণকে কখনোই সুনজরে দেখেনি। ১৯০০ সালের অ্যাক্ট বহাল থাকলেও ১৯৪৮ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ অ্যাক্ট -১৮৮১ বাতিল করে দেয়া হয়। (সূত্রঃ জুম পাহাড়ে শান্তির ঝরণা ধারা-ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-পৃষ্ঠা ২৫)। পাকিস্তানের আমলে এভাবে লুপ্ত হয় পাহাড়ী পুলিশ বাহিনীর অস্তিত্ব। এরকম পরিস্থিতি থেকে পাকিস্তান সরকারের প্রতি জুম্মদের বীতশ্রদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধে জুম্মদের অংশ গ্রহণ প্রসঙ্গে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও বলতে হয়, স্বভাবগতভাবে সাধারণ জুম্মরা ছিল সহজ-সরল প্রকৃতির। তাদের এই সহজ-সরলতার সুযোগে সকল সরকারের আমলে জুম্মরা কেবল শাসিত-শোষিত ও প্রতারিত হয়েছিল। সবচেয়ে প্রতারিত হয়েছিল ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থরা: যারা সরকার থেকে নামেমাত্র ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল। প্রতিটি সরকারের আমলে শাসকগোষ্ঠীর শাসন শোষণের জগদ্দল পাথরের চাপে জুম্মদের সভ্যতার বিকাশ দ্রুত ঘটতে পারেনি। বলার

অপেক্ষা রাখেনা যে, বিভিন্ন সরকারের আমলে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী দ্বারা জুম্মদের সম্পর্কে মনগড়া মন্তব্য করে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। তাদের সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে কোন সরকার আমল দেয়নি। ফলে শাসকগোষ্ঠীর এক কলমের খোচায় একটা ধারা সংশোধন আর এক কলমের খোচায় একটা আইন প্রণয়ন ছিল ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে নিত্য নৈমত্তিক ঘটনা। অথচ সে সবের কোনটাই সহজে জুম্মদের দৃষ্টি গোচর হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিজস্ব প্রথাগত রীতিনীতি দিয়ে জুম্মদের সমাজ চলে আসছিল। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত কোন সরকারী আইন রদ-বদল নিয়ে সাধারণ জুম্মরা খবর নেয়ার জরুরী প্রয়োজন বোধ করেনি।]

১৭৭২-১৭৯৮ খ্রীঃ দফায় দফায় চাকমাদের সাথে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর যে যুদ্ধ, সেযুদ্ধে চাকমারা পরাজিত হলেও তাতে করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জুম্মদের মধ্যে জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল বলা যায়। সেই থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনের জন্য ভাগ কর শাসন কর নীতিকে সুকৌশলে প্রয়োগ করার উদোগ নিয়েছিল দেশ বিভাগের সময়। তাই ব্রিটিশ চলে যাবার সময় যাদের সাথে জুম্মদের খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আদৌ মিল নেই, সেই মুসলমান অধ্যুষিত পাকিস্তানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। সেই দিন থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের জন্য আকাশ ভেঙ্গে মাথায় পড়েছিল। উগ্র ইসলামিক ধর্মান্ধ পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর সাথে সহজ-সরল জুম্মরা পেরে উঠেনি। অপরদিকে জুম্ম সমাজ সামন্ততন্ত্রে আবদ্ধ থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শক্তিশালী জুম্ম জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে পারেনি। শেষতক সদ্যস্বাধীন পাকিস্তান সরকারের করা দেশদ্রোহীতার মামলা মাথায় নিয়ে স্নেহকুমার চাকমা এবং গণেশিয়াম দেওয়ানের মতো জুম্ম নেতৃবৃন্দকে দেশছাড়া হতে হয়েছিল। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার মামলা করলেও তাতে করে তাদের অনুস্মৃত আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটাতে পারেনি। স্নেহবাবুরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনের যে বীজ বপন করেছিলেন (তৎকালীন, পাকিস্তান, ভারত,বার্মা ইত্যাদি), যেখানে রয়েছেন সেই বীজ স্বযত্নে রক্ষা করেছিলেন। হয়েছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে,

অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল স্নেহ কুমার চাকমা ও তাদের পূর্ব পুরুষদের জন্ম ভূমি। তাই ভারতের মাটিতে তাদের সমাধি রচিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের সাথে তাদের ছিল অবিচ্ছেদ্য নাড়ীর টান। জীবদ্দশায় স্নেহবাবুরা প্রতিনিয়ত নিজেদের জন্মভূমির কথা, জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের কথা নিয়েই জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছিলেন। আদিবাসী জুম্ম জাতীয় সংস্কৃতি নিয়েই তারা পরিপুষ্ট হয়েছিলেন। ভারত বিভক্তির আইন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে ভারতে অন্তর্ভূক্ত হবার কথা। তাছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে স্নেহবাবুদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করা। ভারত বিভক্তির সময় শুরু থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য সেরকম একটা সংবিধি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য ছিল। তাই হতে পারেনি বিধায় ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে অদ্যাবধি জুম্মরা বার বার প্রতারিত হয়ে আসছে। অতীতের ব্যর্থতার ইতিহাস পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের নবীন প্রজন্মকে বার বার পীড়া দেয় ও আন্দোলিত করে। তাই '৪৭ সালে সেই আন্দোলনের পুনজাগরণ হয়েছে ষাট দশকে; পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র সমিতি আত্ম প্রকাশের মধ্যে দিয়ে।

পঞ্চাশ দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারত ডোমিনিয়নে অন্তর্ভূক্তির প্রতিবাদে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেমনি তৎকালীন ছাত্র নেতা স্নেহবাবু ও প্রমূখ জুম্ম নেতৃবৃন্দের অভ্যুদয়, তেমনি তদানীন্তন পাকিস্তানের আমলে ষাট দশকের ছাত্র নেতা (১৯৫৬) মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এমএনলারমা)'র অভ্যুদয় ঘটেছিল কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের যথাযথ পূনর্বাসনের দাবীতে সংঘটিত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তাঁর অভ্যুদয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিক উস্মোষিত হয়। তাই ১৯৪৭, ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬২, ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৮৩, ১৯৮৬ ও ১৯৯৭ সাল পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্ম নিয়ন্তণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে একেকটি মাইল ফলক হিসেবে পরিচিহ্নিত। এই সাল গুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে উত্থান-পতনের বিভিন্ন অধ্যায় রয়েছে। স্নেহবাবুদের স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আন্দোলনের ডাক, আর পরিশেষে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নির্দেশিত পথে

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় রারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আঃলীঃ সরকারের ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের আকাবাঁকা সংগ্রামের ইতিহাসে উক্ত সালসমূহ জ্বল জ্বল করছে।

প্রসঙ্গত: যেটুকু না বললে নয়,তাহচ্ছে–পাকিস্তানের গণপরিষদ কর্তৃক ১৯৫৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। পাকিস্তানের এই শাসনতন্ত্রে "১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি" দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি 'পৃথক শাসিত অঞ্চলরূপে'ঘোষণা করা হয়। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। এই দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রেও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান শাসনতন্ত্রে ব্যবহৃত "পৃথক শাসিত অঞ্চল" শব্দের পরিবর্তে "উপজাতীয় অঞ্চল" শব্দ ব্যবহার করে "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি" কে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন পরিচালনার আইন ঘোষণা করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে "উপজাতীয় অঞ্চলের মর্যাদার স্বীকৃতি" দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের প্রথম শাসনতন্ত্র ঘোষিত হয়। এই শাসনতন্ত্রে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের যতটুকু আইনগত অধিকার "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিতে নিহিত ছিল তাও ক্ষুন্ন হয়ে যায়। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১৯ সালের আজ পর্যন্ত এখানে উল্লেখের অবকাশ না থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে এর বেশী কিছু বিজ্ঞমহলের কাছে সবই প্রকাশ্য দিবালোকের মতো পরিস্কার। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর ১৯৭৯ সালে অতীতে যে কোন সময়ের তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সবচেয়ে ব্যাপক হাওে বেআইনী সেটেলার বাঙালি অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ফলশ্রুতিতে ১৯৮৬ সালের ২জুলাই থেকে ১৯৮৯ সালের জুন পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান পরিস্থিতিতে দফায় দফায় ৬২ হাজার জুম্ম নরনারী ভারতের মাটিতে শরনার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তখনো পর্যন্ত স্নেহবাবুরা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় শরনার্থীরা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় লাভ করে। লাগাতার ১২ বছর ধরে শরনার্থীরা আশ্রয় শিবিরে অবস্থান করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,

আশি দশকে স্নেহবাবুর সম্পাদিত, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা থেকে প্রচারিত "টেলিগ্রাফ" নামে একটি অনিয়মিত ইংরেজী প্রত্রিকা বের হতো। এই পত্রিকা পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল। ১৯৮৭ সালের ২১ জুলাই আগরতলায় স্নেহ কুমার চাকমা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পত্রিকাটিও বন্ধ হয়ে যায়।

ষাট দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের ৫৪,০০০.০০ একর আবাদী জমি কাপ্তাই বাঁধে জলমগ্ন হওয়ার পিছনে ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কূট উদ্দেশ্য। কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প প্রনয়ণ এবং বাস্তবায়ন দৃশ্যত: দেশের শিল্পোন্নয়ন হলেও মূলত: জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করণ তথা জুম্মজাতি সমূহের নির্মূলীকরণ উদ্দেশ্য-লক্ষই ছিল মুখ্য। তাই "কাপ্তাই বাঁধ মরণ ফাঁদ" শ্লোগানে ষাট দশকের ছাত্র-যুব সমাজের একমাত্র সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র সমিতি-এর ছাত্রদের প্রতিবাদে রাজপথ প্রকম্পিত হয়েছিল। আসলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়নের জন্য কাপ্তাই বাঁধ কোন প্রয়োজন ছিল না। বস্তুত একটি জাতিকে কীভাবে বিলুপ্তি ঘটাতে হয় তারই একটি মডেল ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কাপ্তাই হাড্রোলিক প্রজেক্ট। তখন থেকেই শুরু হওয়া জুম্মদের উদ্বাস্তু করণ প্রক্রিয়া আজো অব্যাহত রয়েছে; নিত্য নূতন কায়দায়। তারই ধারাবাহিকতায় সরকারী উদ্যোগে বনায়ন ও বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ার নামে জুম্মদের ভূমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি হচ্ছে জাতিগত নির্মূলীকরণ কার্যক্রমের অংশ। তাই এই পার্বত্য চট্টগ্রামের আলাদা বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের লক্ষে এই কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য প্রতিরোধ সংগ্রামের কোন বিকল্প নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের তৎকালীন অর্থনীতিঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। আজ থেকে ২০ বছর আগে সম্পাদিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংকট নিরসন হতো; প্রতিষ্ঠিত হতো শান্তি। আর জুম্মদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কাঙ্খিত উন্নয়নের গতিও ত্বরান্বিত হতো। কারণ এই চুক্তির আওতায় তাদের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সর্বত্র সৃষ্টি হতো একটা

গতিশীল প্রবাহ। পার্বত্য চট্টগ্রাম বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে ইতিমধ্যে চিহ্নিত। বাংলাদেশ স্বাধীনোত্তর কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে অনেক দেশী-বিদেশী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে খনিজ সম্পদের উৎস অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে আসছিল। তদুদ্দেশ্যে আশি দশকের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আকাশে প্রায় সময় অনুসন্ধানী হেলিকপ্টার উড়তো এবং সম্ভাব্য স্থানে ল্যান্ড করে শিলা ও মৃত্তিকা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য নিয়ে যেতো। এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের কতেক এলাকায় খনি থেকে জ্বালানী তেল ও কয়লা নির্গত হতে দেখা যায়। স্থানীয় লোকজন রান্না ও কাপড় আয়রনিং কাজে ঐ কয়লা ব্যবহার করে থাকে। পার্বত্যাঞ্চলের খনিজ ও বনজ সম্পদ সদ্ব্যবহার করতে পারলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন অনায়াসে সম্ভব হতো। সম্ভব হতো সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন। কিন্তু পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ উত্তোলনের প্রক্রিয়া হাতে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়াও এই খনিগুলো ভূগর্ভের ভিতর দিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারত ভূখন্ড পর্যন্ত বিস্তৃত বলে লোক পরম্পরায় শ্রুত। ষাট সালে পাকিস্তানের শাসনামলে শিল্পোন্নয়নের জন্য কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দ্বারা তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কতটুকু সফল হয়েছে সেটা সাধারণ মানুষের কাছে পরিস্কার নয়। কিন্তু আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিপক্ক অবস্থায় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে পড়ে থাকা খনিগুলো সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জুম্মরা অবহিত আছেন। এগুলো উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারলে পার্বত্য চট্টগ্রামাঞ্চল তথা সমগ্র বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে তেল, গ্যাস ও কয়লা খনিগুলো নিশ্চয় উল্লেখযোগ্যভাবে উপকারে আসতো।

জুম্মদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সেতু বন্ধন ও রেগা ঃ

মানব সমাজ, সভ্যতার যে স্তরেই *থাকুক নাকেন তার সাথে* একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক জীবন থাকে। সমাজের মানুষ শুধুমাত্র খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। এর বাইরেও তার প্রয়োজন অবসর ও চিত্ত বিনোদন। মানুষের চিত্ত বিনোদনের সাধারণ মাধ্যম হচ্ছে সঙ্গীত। মানুষ মাত্রেই সঙ্গীতপ্রিয়, অন্যথায় বন্য হিংস্রতা মানুষের মাথায় চেপে বসতো। যেকোন মানুষ হয় গান গায়, নাহয় অন্যের গান শুনে অথবা অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। একজন শিল্পানুরাগী জুম্মও তাই। ঘামে ভিজে, রৌদ্রে পুড়ে সারা দিনভর জুমের কাজে ব্যস্ত জুমিয়া বা কৃষক ফসল ভরা জুম

দেখে অনাগত সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে গান গায়। আর অবসর সময়ে বাঁশী, ধুধুক ও শিঙা ইত্যাদি বাজিয়ে গান ধরে। তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখ, হাঁসি-কান্না, বিরহ-বেদনার কথা গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। পাঠিয়ে দেয় এ পাহাড়ের জুম ঘর থেকে ও পাহাড়ের জুম ঘরে, বন-উপবনে, মাঠে-প্রান্তরে। জুম্মদের সরল জীবন জীবিকার সাথেও জড়িত রয়েছে সরল জুম্ম সাহিত্য সংস্কৃতির ধারা। তাতে লোক সাহিত্যও রয়েছে। বেঙ্যমা-বেঙ্যমী পক্ষী, রংরাং-সুদত্তুপি, কুচ্চবেঙ শহরত্তুন ফিরানা, দুলু কুমারীর পচ্চন, হ-বি-ড-বি পচ্চন ইত্যাদি কয়ে-বলে নানা-নানীরা কচি-কাঁচাদের মাতিয়ে রাখতো। এসব গল্প বা রূপকথার কাহিনী সব মৌখিক। প্রাচীনকালে প্রবীনদের কাছে রামায়ণ, মহাভারত ছিল আকর্ষণীয়। অবসর মূহুর্তে রামায়ন মহাভারতের নানা পর্ব পাঠ করে নিজেদের মজিয়ে রাখতো। তরুণ-তরুণীদের কাছে গেংখুলী গীত ছিল প্রধান আকর্ষণ। চাদিগাঙ ছাড়া পালা ছিল গেঙখুলী গীতের মধ্যে সবচেয়ে করুণ পালা। এই পালা নাকি সমৃদ্বশালী গ্রামের মাঝখানে শুনতে গেলে গ্রাম ভেঙে যায়। এই রকম একটা সংস্কার জুম্মদের মধ্যে প্রচলিত থাকায় চাদিগাঙ ছাড়া পালা শুনতে হলে গ্রাম থেকে দূরে জঙ্গলের মাঝখানে গিয়ে এই পালা শুনার রেওয়াজ প্রবর্তিত হয়েছিল। জুম্মরা কীভাবে কীকারণে সমতল চট্টগ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল তার করুণ কাহিনীর বর্ণনা গেঙখূলীদের মুখে শুনা যেতো। আর ছিল বৎসরের বিভিন্ন সময়ে মৌসুমী ফসল বুনা ও তুলার সময়ে জুম্মদের স্বরচিত বারোমাসী পালা গান। তাছাড়াও রাধামন-ধনপুদি পালা, চান্দবী বারো মাস, তান্যাবীর পিত্তি, ইত্যাদি প্রেম উপখ্যান সম্বলিত পালা গান ছিল তরুন-তরুণীদের মুখে মুখে। সম্প্রতি ঠেঙাভাঙা গান নামে জুম্মদের মধ্যে আরেক প্রকার পালা গান শুনা যায়। প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরামের গানের সুর লহরী অনুকরণে এখন পার্বত্য চট্টগ্রামেও গাওয়া হয়। বিশেষ করে প্রেমিক-প্রেমিকা সেজে সামনাসামনি এই পালা গান শিল্পিরা গেয়ে থাকেন। যেখানে প্রেমিক-যুগল তাদের জীবনের চাওয়া-পাওয়া নিয়ে মনের কথা ব্যক্ত করে। পৃথিবীর সব প্রান্তের জুম্মরা এই সব শিল্প সাহিত্যের অনুরাগী। সাম্প্রতিককালে জুম্ম সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আরেকটা বিষয় দেখা যায়। তাহচ্ছে একই অর্থ, একই সুর ও ছন্দ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় একই মঞ্চে একটি দলীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। শিল্পিদের সবার গায়ে গান সংশ্লিষ্ট সব জাতি সমূহের পোষাক শোভা পায়। সঙ্গীতাঙ্গনে এই যে জুম্ম সাংস্কৃতির ধারা, তা হচ্ছে সত্যিকার অর্থে জুম্ম জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। বার্মায় যে সমস্ত চাক জাতিগোষ্ঠীভূক্ত সম্প্রদায়

বসবাস করতেছে তাদের নিজস্ব ভাষা দিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতিকে সাজাতে শুরু করেছে। তাদের এতিহ্যবাহী পোষাক আধুনিক ঢঙে ব্যবহার করে সাংস্কৃতিক মঞ্চে সগৌরবে হাজির হচ্ছে। চাকমাদের বেলায়ও অনুরূপভাবে শিল্প চর্চা চলছে। ইউটিউবে এবং এফবিতে সেসব দেখা যায়। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ থেকে যেসব জুম্ম পর্যটক এবং তীর্থযাত্রী বার্মা (মায়ানমার) সফরে যায়, তারা এখন নগদ মুদ্রা সঙ্গে নেয়ার বদলে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীদের ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় (পিনোন, খাদি ইত্যাদি) সঙ্গে করে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, সেখানে চাকমাদের জাতীয় পরিচয় হচ্ছে "দৈনাক"; আর চাকদের পরিচয় "সাক"। ভাষাগত ক্ষেত্রেও সাক (চাক) আর চাকমা (দৈনাক) দের ভাষা পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক ও চাকমাদের ভাষার অনুরূপ। তবে উচ্চারণভঙ্গী বার্মার সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বার্মিজ ভাষার ধাসে।

আদিবাসী জুম্মজাতি গোষ্ঠীর মানুষ ভিন্ন দেশের অধিবাসী হলেও জুম্মদের ভাষা এক। ভাষা লেখার হরফ এক। দেশ আর অঞ্চল ভেদে তাদের কণ্ঠস্বর বা উচ্চারনভঙ্গী অপেক্ষাকৃত আলাদা। কিন্তু তাদের চলন-বলন, জীবন-জীবিকা, সামাজিক রীতি-নীতি একই সূত্রে গাথা। প্রত্যেক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র (জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে) অনুষ্ঠান রয়েছে। সর্বোপরি অর্থনৈতিক জীবন এক হওয়ায় তাদের সামগ্রিক জীবন প্রবাহ এক ও অভিন্ন। তাই তারা জুম্ম জাতি হিসেবে পৃথিবীর সব প্রান্তে নিজেদের পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তারা নিজের ভাষায় বক্তব্য দিয়ে পরিচয় দিয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে দশ ভিন্ন ভাষী আদিবাসী জুম্ম আছে; যারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে নিয়োজিত।

উত্তরকূল, দেজকূল, গোমেতকূল আর বোঙ্কুল ইত্যাদি হচ্ছে জুম্মদেও দেয়া নাম। এক সময় জীবনজীবিকার তাগিদে জুম্মরা জুম চাষ করতে করতে ঘুরে-ফিরে এ সমস্ত এলাকায় অস্থায়ী বাসস্থান গড়েছিল। সে সূত্রে এখন জুম্মরা ভিন্ন দেশের অধিবাসী হলেও তাদের আত্মিক বন্ধন অটুট রয়েছে। আন্তর্জাতিক ভৌগলিক সীমানা জুম্মদের এই বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারেনি। সব দেশের জুম্মদের কাছে লোক সাহিত্য এক ও অভিন্ন ধারায় প্রবাহমান। যে যেখানে বসতি গড়েছে সেই পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখেই সে সমস্ত লোক সাহিত্য চর্চা করে থাকে। *যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্ণফূলী নদীর নাম কীভাবে হয়েছে তা নিয়ে কিংবদন্তী কাহিনী আছে। অনুরূপভাবে গোমতী নদীর উপত্যকায় বসবাসকারী ত্রিপুরা রমণীর অজগড় সাপের সাথে* বিয়ের

কাহিনী ইত্যাদি রূপ কথা বা পচ্চন জুম্মদের পরস্পরকে গভীর সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। রাধামন-ধনপুদির পালা, চাদিগাং ছাড়া পালা ইত্যাদি পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের জুম্ম গেংখুলীরা (চারন কবি) একই ভাবে গেয়ে থাকে। অতি সম্প্রতি অরুনাচল ও বার্মার চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম গাথাও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা গেঙখুলীদের মতো করে গেয়ে থাকেন।

কালের বিবর্তনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি হারিয়েছে তার উর্বরতা ক্ষমতা আর জুম্মরা হারাতে বসেছে তাদের পুরোনো জাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি। বাংলাদেশের বাইরে যারা বসবাস করছেন তাদের কাছে উগ্র সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হয়তো এখনো ঘটেনি। তবে ভবিষ্যতে যে ঘটবে না সেকথা হলফ করে কেউ বলতে পারে না। কারণ, বিশ্বেও সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতিগোষ্ঠীর শাসক শ্রেণীর সংস্কৃতি অন্যান্য শাসিত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে গ্রাস করে থাকে। সেটা হতে পারে জীবন-জীবিকা বা চাকরীর সুবাদে, হতে পারে চর্চার অভাবে,চেতন-অবচেতন মনে ইত্যাদি নানাভাবে। যেমন ইউরোপে অভিবাসিত জুম্মদের শিশুরা এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে আসলে জুম্মদের ভাষা বুঝেনা। তাদের পিতামাতা কর্মসংস্থানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্যাগ করে সেখানে গেছেন। কাজে যাবার সময় চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে পিতামাতারা তাদের সন্তান-সন্ততিদের রেখে যান। এভাবে দিনের অধিকাংশ সময় শিশুরা অভিবাসনকারী দেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বেড়ে উঠতে থাকে। আচার ব্যবহার কথা বার্তাও সেদেশের ধাসে গড়ে উঠে।

জুম্মরা ঐহ্যিগতভাবে অতিথি পরায়ণ। জুম্মদের মধ্যে ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর লোকজনরা অতিথিকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে মনে করতো। বাড়িতে অতিথির আগমন ঘটলে তাতে তারা নারায়ণের আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য করে থাকে। প্রতিবেশী রাজ্যে বসবাসকারী জুম্মরা অপূর্ব আতিথেয়তায় পরস্পরকে আপ্পায়ন করে থাকে। এক কথায় বাঙালিদের বেলায় যেমন এপার বাংলা ওপার বাংলা আর জুম্মদের বেলায় হচ্ছে দেশকূল, উত্তরকূল আর দক্ষিণকূল। এই অঞ্চলের জুম্মরাই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি বাসিন্দা, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম আবাদ করেছে। ভিন্ন রাষ্ট্রের ভূ-খন্ডে বসবাস করলেও তারা এখনো যেন একই পরিবারেই সদস্য। একই অঞ্চলের বাসিন্দা দেশকূল-উত্তরকূলের জুম্মরা ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের (রিয়াং, ত্রিপুরা, মিজো, উচই, চাকমা ইত্যাদি) জুম্মদের কাছেও পরস্পরের নিকটতম প্রতিবেশী, যারা বারো মাসের তেরো পার্বনে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে

মিলিত হয়ে থাকে। আজো ভারতে ফি-বছর অনুষ্ঠিত কুম্ভ মেলা, পৌষ চংক্রান্তি মেলা চলাকালে ভারত-বাংলাদেশ উভয় সরকারের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান উপলক্ষে (আদিবাসী জুম্ম) সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য সীমান্ত পাড়াপাড় উন্মুক্ত রাখা হয়। তারা বৈটিত্র্যময় সংস্কৃতির ধারক-বাহক ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম হিসেবে প্রায় ৫০০ শতাধিক বছরের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের উত্থান-পতন, শাসন-শোষণের নীরব স্বাক্ষী। উভয় কূলের জুম্মদের এই ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক মেইল বন্ধন উত্তরকূল এবং দেশকূলের জুম্মদের বিকাশের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে "রেগা" নামে আদিবাসী জুম্মদের একটি ঐতিহ্যবাহী আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সংগঠন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এই সংগঠনের কাজের ধারাবাহিকতায় ভারতের আদিবাসী সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিঝু উপলক্ষে বিশেষ সফরে এসে থাকে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, ২০১৬ সালের ২৪/২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আদিবাসী লেখক ফোরামের সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রেখেছিলেন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা থেকে আগত বিশিষ্ট লেখক, গৌতম লাল চাকমা। বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষক, প্রাইয়ারী মঘ চৌধুরী ও এডভোকেট মঙ্গল দেব ব্রক্ষণ প্রমূখ। ২০১৮ সালে রাঙ্গামাটির সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গনে বিজু মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিজু উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বিশিষ্ট শিল্পি নিরঞ্জন চাকমা ও শান্তি বিকাশসহ ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আগত প্রমূখ স্বনামধন্য জুম্ম শিল্পিবৃন্দ। তারপর সপ্তাহ খানেকের ব্যবধানে আসাম থেকে আগত অহমিয়া শিল্পি বৃন্দ রাঙ্গামাটির আসামবস্থীতে আসামীদের আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সৌজন্যমূলক বক্তব্য দান শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাদের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য ও গান পরিবেশন করেন। অনূষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ২৯৯ আসনের সংসদ সদস্য (এম.পি) শ্রী ঊষাতন তালুকদার প্রধান অতিথি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ভারতের আসাম রাজ্যের অহমিয়া শিল্পিদের পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

ভারত-বাংলাদেশ-এর আদিবাসী সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণে এ ধরণের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আদিবাসী জুম্মদের শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতির বিকাশকে উত্তরোত্তর অনুপ্রাণীত ও উৎসাহিত করবে। বৃহত্তর জুম্ম জাতীয়

ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখবে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নির্ধারিত ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে নাগরিক জীবন সীমাবদ্ধ। কিন্তু একটা শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা কোন রাষ্ট্রীয় ভৌগলিক সীমানায় আবদ্ধ *থাকতে পারে না। যেমনি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ* ঠাকুর আর বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সাহিত্য ধারা এপাড় বাংলা ওপাড় বাংলার বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সংস্কৃতির কোন সীমারেখা নেই। একটা ভাষা ব্যবহার যে কোন মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। সেই ১৯৭০ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের গিরিসুর শিল্পি গোষ্ঠীকে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল্। গ্রামফোন যুগে যে আদিবাসী গিরিসুর শিল্পি গোষ্ঠীর যাত্রা আজকে সেই আদিবাসী সংস্কৃতি আর সেই পুরোনো জায়গায় থেমে নেই। ডিজিটাল যুগে এসে আধুনিক জুম্ম শিল্পি ও সাহিত্যকরা নানা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ইউটিউবে এবং নানারকম সামাজিক যোগাযোগের মা্ধ্যম পর্যন্ত তাদের শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসনতান্ত্রিক ধারার সাথে সংগতি রেখে জুম্মদের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। শাসনতান্ত্রিক অধিকার যখন যেরকম ছিল আদিবাসী জুম্মরা ঠিক ততটুকুই নিজেদের সংস্কৃতি চর্চা করার সুযোগ লাভ করেছিল। যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হতো তাহলে জুম্মরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সংস্কৃতির সমপর্যায়ে নিজেদের সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারতো। যেকোন জাতির শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সেজাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

পরিস্থিতির শিকার হয়ে যারা যেখানে গিয়েছে সেখানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে ও নিজেদের সংস্কৃতি ধরে রেখেছে। তাতে অবশ্য ব্যতিক্রম যে ঘটেনি সেটা বলা যায় না। তবে জুম্মদের অধিকাংশই নিজেদের সংস্কৃতিকে সহজে হারাতে চায়না। সে জন্য দেশকূল-উত্তরকূল দু'কূলের জুম্মদের মধ্যে "রেগার" মতো সাংস্কৃতিক সেতু বন্ধন রচনা করা সম্ভব হয়েছে। দেজকূল-উত্তরকূলসহ অন্যান্য সর্বত্র জুম্মদের মধ্যে পোষাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, সামাজিক রীতিনীতি, নাচ-গান, কথা-বার্তা, রুচি-অভিরুচি, ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠান ইত্যাদি সর্বত্রই সাদৃশ্য বজায় রয়েছে। বৌদ্ধ প্রধান কিংবা সনাতন ধর্ম প্রধান দেশের জুম্মরা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের চিনে নিতে কোন সমস্যা হয়না। সেখানে উগ্র সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আর মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো দুর্ঘটনার দৃষ্টান্ত কম। সেখানে সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা

আছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়েছে জুম্ম সংস্কৃতি পরিপন্থী উগ্র ইসলামিক সম্প্রসারনবাদের আগ্রাসন। রয়েছে জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব বিলোপ সাধনের হাতিয়ার হিসেবে যৌন সহিংসতা। সব দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ পার্বত্য চট্টগ্রামকে সুখী-সমৃদ্ধশালী পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার জন্য সকল জুম্মদের সুখে-দুখে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে রেগার মাধ্যমে সুখদুখের ভাব বিনিময় হতে থাকবে।

উপসংহারঃ

খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকতে গেলে যে কোন মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পুরণ হওয়া চায়। তার জন্য জীবিকার সন্ধানে মানুষ বিশ্বময় চষে বেড়ায়। কেহ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে দাবীদাওয়া আদায়ের আন্দোলন করতে বাধ্য হয়। অন্যথায় ভোগান্তি ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর থাকেনা। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মরাও তাই করতে বাধ্য হয়েছে। '৪৭ সালে স্নেহ বাবুরা আন্দোলন করেছিলেন। ব্যর্থ হয়ে তাদেরকে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে। কাপ্তাই বাঁধের ফলে লক্ষাধিক জুম্ম সীমান্ত পাড়ি জমিয়েছে প্রতিবেশী রাজ্যের উদ্দেশ্যে। কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থ জুম্মদের হয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে মহান নেতা এমএন লারমাকেও '৬২ সালে কারা বরন করতে হয়েছে '৬২ সালে। কিন্তু তখনকার জুম্ম ছাত্র-জনতার ঐক্যশক্তির কাছে হার মেনে পাকিস্তান সরকার ১৯৬৫ সালে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। কারা মুক্তির পর আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। তাঁর সংগঠিত আন্দোলনের ফসল হিসেবে ১৯৯৭ সালের ২ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজকে পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হলে '৪৭ সালের মতো উপর্যূপরি প্রতারিত হতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদেরকে। অতীতে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার কথা আলোচনা হলেও বেঙ্গল বর্ডার এওয়ার্ড কমিশনের চেয়ারম্যান, স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিপের এক কলমের খোচায় তা ভন্ডুল হয়ে যায়। আজকের দিনেও দেশের শাসকগোষ্ঠীর একটি স্বার্থান্বেষী মহলের একদেশ দর্শিতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন অনিশ্চিত পর্যায়ে। অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মরা রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে বার বার উদ্বাস্তু হয়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে দেশে-বিদেশে। বিদেশ অবিভাসন দ্বারা জীবন জীবিকার ঠাঁই হতে পারে কিন্তু কোন জাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণ হতে পারে না। সুতরাং জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ নিজ দেশেই করতে হয়। তবে সব কাজে

সফলতার ভিত্তি হচ্ছে ইস্পাত কঠিন ঐক্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও তাই। বিভেদ নয়, প্রয়োজন সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ইস্পাত কঠিন জুম্ম জাতীয় ঐক্য। অন্যথায় শাসকগোষ্ঠী সর্বত্রই 'ভাগ কর শাসন কর' নীতি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জুম্মদের মধ্যে অর্ন্তকলহ জিইয়ে রাখার সুযোগ নিয়ে থাকবে। দুঃখজনক হলেও একথা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই যে,আজকে দেশের একটি স্বার্থান্বেষী মহল পার্বত্য চুক্তি পরিপন্থী কার্যকলাপ এবং চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে বিভ্রান্তিকর জনমত গঠনে লিপ্ত রয়েছে। শান্তিকামী জুম্ম জনগণের ভাগ্য নিয়ে চিনিমিনি খেলা করার অধিকার কারো নেই। জুম্মরা নিজেদের অস্তিত্ব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় সব কিছুই করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং হিল চাদিগাঙের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়া এবং জুম্মদের ভাগ্য নির্ধারন করার ক্ষমতা জুম্মদের হাতেই। জুম্মদের যাযাবর জীবনের অবসান ঘটবে। হিল চাদিগাঙের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। নিজের ভিটেবাড়ী ছেড়ে জুম্মদের আর কোথাও বড় পরঙ যেতে হবে না। সেরকম উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়, সুখী ও সমৃদ্ধশালী হিল চাটিগাঙের দিকে তাকিয়ে জুম্মরা যুগ যুগ ধরে বেঁচেছিল, বেঁচে আছে এবং থাকবে।

তথ্য সূত্র ও টীকাঃ

**ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে চাকমা জাতির প্রতিরোধ সংগ্রাম (১৭৭২-১৯৯৮)*
**সূত্রঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ইতিকথা-শরদিন্দু শেখর চাকমা]*

- *"জুম পাহাড়ে শান্তির ঝরনাধারা"-ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি,পৃঃ২৫, পৃঃ২৬,পৃঃ২৭)।*

টীকাঃ

জাতি পরিচয়- "আজ থেকে ৫০০ বছর আগে ডি ব্যারোসের মানচিত্রে চাকমাদের যে বসতি অঞ্চল দেখানো হয়েছে এখনো পর্যন্ত সেই অঞ্চলটিই চাকমাদের মূল ভূখন্ড রয়ে গেছে। ড.বুকানন যিনি চাকমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখেছেন, তিনি তাঁর গ্রন্তের কোথাও চাকমাদের Tribe ev Tribel নামে উল্লেখ করেন নাই। তিনি চাকমাদের 'a nation' কিংবা '-a people' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত পন্ডিত সতীশ ঘোষ তাঁর গ্রন্থে নামকরণ করেছেন 'চাকমা জাতি' নামে। (সূত্রঃ ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে চাকমা জাতির প্রতিরোধ সংগ্রাম(১৭৭২-১৭৯৮) অধ্যাপক ড.সুনীতি ভূষণ কানুন গো।

পরিচিতি : *ধীর কুমার চাকমা,সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য,পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।*

শুভ্র জ্যোতি চাকমা

চাকমা জাতিসত্ত্বার উদ্ভব সম্পর্কিত ধারণা

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী প্রত্যেকটি সংখ্যালঘিষ্ট নৃ-তাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী মঙ্গোলয়েড। অবিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রথম জেলা প্রশাসক টি.এইচ. লুইন-এর মতে-The general physique of the hill tribes strongly Mongolian. They are, as a rule, short in stature, alout 5 feel 6 inches in height. Their face are broad; the nose flat, with no perceptible bridge; the eyes narrow, and set obliquely in the head, high cheek bones, and no beard or moustache. They have an honest bright look, with a frank and merry smile; and their look does not belie them, but is faithful index of their mental characterities.[১] লুইনের এ বিবরণ অনেকখানি সঠিক বলে ধরে নেয়া যায়। তবে ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, আবহাওয়া পরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী সংখ্যালঘিষ্ট নৃ-গোষ্ঠীগুলোর আকার-আকৃতিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে চাকমারা মঙ্গোলয়েড। এইচ.এইচ. রিজলি'র বিবরণেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়-Since this was written one hundred specimens of the Chakma tribe have been measured under my supervision. The cephalic index deduced from this large number of subjects is 84.6, and the average naso-malar index 106.4. A tribe so markedly brachy-cephalic and platyopic must clearly be classed Mongoloid.[২] অদ্যাবধি তাদের মধ্যে মঙ্গোলয়েড মানবজাতির বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রয়েছে।

চাকমারা নিজেদেরকে শাক্যবংশীয় মনে করেন যে বংশে মহামতি গৌতমবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ ধারণা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয়, চাকমারা অতি প্রাচীন একটি জাতি। তবে অদ্যাবধি এর স্বপক্ষে কোনো যুক্তিনির্ভর এবং গ্রহণযোগ্য তথ্য বা ইতিহাস আবিষ্কার করা যায়নি। বিশেষত প্রাচীনকালের সাথে বিগত ৫শত বৎসর পূর্বের ইতিহাসের মধ্যে তথ্য ঘাটতি রয়েছে এবং সেই সময়ের যে ইতিহাস রচনা করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় সেটিকে ইতিহাস হিসেবে স্বীকার করা যায় না। পল্লী গায়ক গেংখুলিদের ইনিয়ে-বিনিয়ে গাওয়া রম্য কাহিনীগুলোকে পূর্ব থেকে চাকমাদের মধ্যে ইতিহাস বলে মনে করার প্রবণতা রয়েছে। অধিকন্তু

অশোক কুমার দেওয়ান-এর মতে, তিনিই (সতীশ চন্দ্র ঘোষ[৩]) সর্বপ্রথম আরাকান কাহিনী 'দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং' এর বরাত দিয়ে চাকমা জাতির ইতিহাসকে ব্রহ্ম আরাকান ইতিহাসের সংগে সম্পৃক্ত করেন। পরবর্তী গ্রন্থাগারগণ সতীশ বাবুর এ সম্পর্কিত কাহিনীগুলো প্রায় অবিকৃতভাবে তাদের পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে নির্বিবাদে সেসব কাহিনীকে চাকমা জাতির ইতিহাস হিসাবে কেবল স্বীকার করে নিয়েছেন তা নয় বরং নিজেদের কল্পনাশক্তির প্রয়োগে কাহিনীগুলিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আরও জৌলুস বাড়াবার চেষ্টা করেছেন। অধিকন্তু সতীশ ঘোষের দেওয়া বর্মী নামগুলিকে সংস্কার করে সেগুলিতে চাকমা গন্ধ দিয়ে চাকমা জাতির ইতিহাসের সংগে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।[৪]এভাবে ইতিহাস গ্রন্থের কলেবর মোটা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাতে আবর্জনা যতখানি জমেছে আসল বস্তু তত জমেনি।[৫]

চাকমা জাতিসত্ত্বার উদ্ভব নিয়ে বৃটিশ শাসকদের উদঘাটিত কাহিনী যেমনি রয়েছে তেমনি রয়েছে চাকমাদের নিজস্ব কাহিনী। লুইন তাঁর বইয়ে খ্যংথাদের বরাত দিয়ে যে কাহিনী তুলে ধরেছেন সেটি এরূপ-The Chukma were originally Moguls, or Mussulmans. Once the "Wuzeer'' of Chittagong collected together an army to attack the king of Arracan; and as the force went travelling over the hills, they came to the hut of a Poongyee, a holy man in the wilderness. This Poongyee begged the Wuzeer to halt and partake of some refreshment which be would quickly prepare; and to this the Wuzeer consented. After some time, as the food did not make its appearance, he sent a soldier to the Poongyee's hut to see when it would be ready. The soldier entered the hut and saw that the Poongyee had put rice and flesh in a pot, and had placed the pot over the fire-place; but he noticed with astonishment there was no wood in the fire-place: instead thereof the Poongyee had put his foot under the pot, and flames were issuing from the tips of toes. So the soldier returned to the Wuzeer and made his report. On hearing the man's statement, the Wuzeer became enraged, and said, "At that rate the rice will never be ready;'' and he gave orders for the march to be recommended. Consequently, when the holy man came out to redeem his pledged hospitality, he found his guest had unceremoniously departed. On this the Poongyee waxed very wrath, and he cursed the Wuzeer and all his army, and sent forth powerful charms after them, so that when they met the King of Arracan's troops, their hearts turned to water, and they were all made prisoners. The King of Arracan settled all

these Mussulmuns as slaves in his territory, and gave them wives of the people of the country; and they increased and multiplied. This was the origin of the Chukma tribe.[৬] ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে আরাকান বাহিনীকে পরাস্ত করে চট্টগ্রামে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তৎকালীন বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানের পুত্র উমেদ খান চট্টগ্রামে ফৌজদারের দায়িত্ব লাভ করেন। কিন্তু উমেদ খান বা তৎপরবর্তী অন্য কোনো ফৌজদারের কোনো সৈন্যবাহিনী আরাকান রাজার কাছে বন্দী হওয়ার ঘটনা আরাকান বা চট্টগ্রামে ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এছাড়া একজন ফুঙ্গি নিজের পাগুলোকে চুলায় ঢুকিয়ে আগুন জ্বালানোর ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। Selection from the correspondent on the revenue administration of the Chittagong hill tracts গ্রন্থেও লুইন উল্লিখিত কাহিনীটির মূলভাব পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে-The Chakmas, whose prevalence is in the centre of the Chittagong hill tracts and in the Karnafuly Valley, are indeed an instance of a very strong and exclusive clan or cast. The most reasonable account of their origin is that they are the products of unions between the Nowab Shaista Khan's soldiery and Mag women, and that the caste or clan was formed within the last 200 years or so---.[৭] পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস নামক গ্রন্থের লেখক জামাল উদ্দীন রাজা ধরম বক্স খাঁ'র পূর্ববর্তী চাকমা রাজাদেরকে শাহ সুজার সেনাপতি এবং তাদের বংশধর বলে উল্লেখ করেছেন। চট্টগ্রামে মুঘলদের অধিকার প্রতিষ্ঠান সময় থেকে লুইন-এর বইটি প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে ব্যবধান ২০৩ বৎসর। একটি নব প্রজন্ম বেড়ে উঠতে উঠতে আরও অনেক বছর প্রয়োজন। সে হিসেবে চাকমা জাতির উদ্ভব সতেরশ শতকের শেষান্তে ধরতে হয়। এ প্রশ্নও প্রাসঙ্গিক যে, মোঘল সৈন্য এবং আরাকানিজ মহিলাদের ঔরষজাত প্রজন্মদেরকেই সাক বা থেক বা সেক সর্বোপরি আধুনিক চাকমা নাম দেয়া হল কেন? অধিকন্তু তারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী না হয়ে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হল বা কেন? সুতরাং লুইন উল্লিখিত কাহিনীটি নিছক জনশ্রুতি বৈ কিছু নয়। প্রসঙ্গত যে, চট্টগ্রামে মোঘল অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় আরাকানের রাজা ছিলেন সান্দাথুধর্ম্মা। তিনি আরাকান রাজাদের পূর্বের সব উপাধি বাতিল করে 'সুবর্ণ প্রাসাদের অধীশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেন।[৮]

এখন চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতিটি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। চাকমারা বিশ্বাস করেন, প্রাচীন হিমালয়ের পাদদেশে কলাপনগর নামে একটি রাজ্য ছিল। চম্পককলি নামে জনৈক রাজা কলাপনগর থেকে তাঁর রাজধানী চম্পানগর বা চম্পকনগরে স্থানান্তর করেন। রাজা চম্পককলির

উত্তর পুরুষ রাজা উদয়গিরির দুই পুত্র-বিজয়গিরি(চাকমা উচ্চারণে বিজগ্রী) এবং সমরগিরি। দক্ষিণে আরাকান রাজার রাজ্যবিস্তারে বাঁধা দেয়ার নিমিত্তে যুবরাজ বিজয়গিরি সসৈন্যে সেনাপতি রাধামনকে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি একে একে মগদেশ, খ্যাংদেশ, কাঞ্চননগর, কালঞ্জর প্রভৃতি দেশ জয় করার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে শুনতে পান যে, তাঁর পিতা পরলোকগমন করেছেন। রাজার অবর্তমানে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশংকায় প্রজারা কনিষ্ট রাজকুমার সমরগিরিকে সিংহাসনে বসিয়েছেন। ক্ষোভে, দুঃখে বিজয়গিরি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করে বিজিত রাজ্য 'সাপ্রেইকুলে' প্রত্যাবর্তন করে নতুন চাকমা রাজ্য পত্তন করেন। তিনি নিজে এক আরি[৯] জাতির রমণীকে বিয়ে করেন এবং সৈন্যদেরকে সেদেশের রমণী বিয়ে করার অনুমতি দেন। চাকমাগণ মনে করেন, অধুনা চাকমাগণ রাজা বিজয়গিরি এবং তাঁর সৈন্যদের বংশধর। অপরদিকে চম্পকনগরে থেকে যাওয়া চাকমাগণ বিভিন্ন জাতির সাথে মিশে গিয়ে অস্তিত্ব হারিয়েছে। ক্ষুদ্র কিছু অংশ মূল জাতির সাথে এসে মিশেছে।

চাকমা যুবরাজ বিজয়গিরির এ কাহিনীটির সুনির্দিষ্ট সময় জানা যায় না। নিরূপন করা যায়নি চাকমাদের আদিনিবাস চম্পকনগরের সঠিক অবস্থান। বিরাজ মোহন দেওয়ান বিজয়গিরির রাজ্যোভিযানের সময়টি ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। তবে চাকমাদের জনশ্রুতি, চাকমা পল্লীগায়ক গেংখুলিদের গাওয়া রাধামন-ধনপুদি পালায় মেঘনা নদীর কথা, ত্রিপুরার নূরনগর, রাধামনের জয় নারায়ন রোয়াজার[১০] নিকট যুদ্ধের সঙ্গী খুঁজতে যাওয়া, রাধামনের অধিনস্ত সেনাপতি কুঞ্জধন ত্রিপুরার সূত্র ধরে সতীশ চন্দ্র ঘোষ চম্পকনগরের অবস্থান ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতর বলে যে অনুমান করেছিলেন তা উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। বিষয়টি গবেষণা দাবি রাখে। যামিনী রঞ্জন চাকমা'র মতে, এটি শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থান।[১১] অপরদিকে কোনো কোনো লেখক চম্পকনগরের অবস্থান থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া বা মায়ানমারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে, চাকমারা দক্ষিণ দিক দিয়ে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন। আবার অধিকাংশ লেখক এবং চাকমারা মনে করেন, উত্তর দিক থেকে চাকমারা চট্টগ্রাম হয়ে সর্বশেষ আরাকান রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। আরাকান রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হওয়ায় তারা পুনঃ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। এরূপ মত-দ্বিমতে চাকমাদের ইতিহাস

চর্চা চলছে সিদ্ধান্তহীনতার মধ্য দিয়ে। এ কারণে চাকমা জাতির উদ্ভব, বিকাশ সর্বোপরি এদেশে আগমন নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, চাকমারা নিজেদেরকে শাক্য জাতির শাখা মনে করে থাকেন। আমরা জানি বুদ্ধের সময়ে শাক্যবংশকে নিশ্চিহ্ন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কোসলরাজ প্রসেনজিতের পুত্র বিড়ূঢ়ভ শাক্যদের উপর ধ্বংশযজ্ঞ চালিয়ে হাজার হাজার শাক্যকে হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করেছিল। বিড়ূঢ়ভের নিষ্ঠুর আক্রমণে শাক্যরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ক্ষুদ্র কিছু শাক্য দেশ ছেড়ে প্রাণে বাঁচে। চাকমাদের বিশ্বাস, সেই প্রাণে বেঁচে যাওয়া শাক্যদেরও উত্তরসূরী তারা। নিজস্ব লিখনিতে তারা তাদের অতীত জাতীয় জীবনের শৌর্য-বীর্যের অনেক কাহিনী তুলে ধরেছেন যেগুলো চাকমাদেরকে প্রাচীনকাল থেকে একটি সমৃদ্ধশালী, বীরত্বপূর্ণ এবং দুর্দান্ত প্রতাপশালী জাতি হিসেবে প্রমাণ করে। তবে অন্যান্য ইতিহাসবিদদের লিখনিতে তার বিন্দু-বিসর্গ পরিমাণও স্থান পায়নি। এজন্য চাকমাদের প্রাচীন ইতিহাস এখনো তমাচ্ছন্ন। চাকমা জাতির উদ্ভব, তাদের ইতিহাস নিয়ে পরস্পর বিরোধী তথ্যই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে। তথ্যগুলো এমনই পরস্পর বিরোধী যে, কোনোটির সাথে কোনোটি মেলানো যায় না।

বর্তমান নেপাল রাষ্ট্রে এখনো শাক্য নামধারী জাতিসত্ত্বার বসবাস রয়েছে। ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে চাকমাদের সাথে তাদের সম্পর্কের সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। তবে নেপালে বসবাসকারী শাক্য পদবিধারীও আসল শাক্যবংশীয় কি না তা দেখার বিষয়। স্বজাতীয় লেখকগণ যারা চাকমা ইতিহাস রচনা প্রয়াস পেয়েছিলেন তারা নির্দ্বিধায় লিখেছেন, চাকমারা শাক্যবংশীয়। আর এসব তথ্য অবহিত হয়ে বংশপরম্পরায় চাকমারা নিজেদেরকে শাক্যবংশীয় বলে মনে করে থাকেন। এ প্রেক্ষাপটে আমরা চাকমা নামকরণের মধ্য দিয়েই এই জাতির উদ্ভবের বিষয়টি সুরাহা করার চেষ্টা করতে পারি।

পরিচয় দেওয়ার সময় চাকমারা নিজেদেরকে 'চাঙমা' বলেন এবং লেখার সময় লিখে থাকেন 'চাকমা'। এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরীরা 'ছাখমা'[১২], বাংলাদেশের ত্রিপুরারা 'চংমা' বা কুরুমু[১৩], মারমাসহ আরাকানের অধিবাসীরা 'সাঃক' বা ঠেক[১৪](থেক), মিজোরা 'তাকাম'[১৫], লাখেররা 'তুইচেক'[১৬],

বাংলাদেশের পাংখোয়ারা 'আইএং'[১৭]এবং চট্টগ্রামের বাংলাভাষী লোকেরা 'চাম্মুয়া'[১৮]' বলে ডাকেন। লুইন লিখেছেন Chukma(চুকমা). তিনি আরো লিখেছেন-It is also sometimes spelt Tsakma, or Tsak.[১৯] এছাড়াও বার্মিজরা চাকমাদেরকে বলে থাকেন 'থেক'(Thek)। বার্মিজরা অনেক ক্ষেত্রে এঃয-কে 'স' ধ্বনি হিসেবে উচ্চারণ করে থাকে। এজন্য 'থেক'(Thek)-শব্দটির উচ্চারণ হয়ে যায় 'সেক'। G Tsakma, or Tsak, সাক বা থেক বা সেক, চাম্মুয়া শব্দগুলো স্পষ্টত শাক্য শব্দটির অপভ্রংশ শব্দ। জাতিভেদে উচ্চারণ ভিন্ন হওয়া এবং উচ্চারণ দোষে কালে কালে শাক্য শব্দটি বিকৃতি বা অপভ্রংশ হয়েছে। লুইনের বর্ণনা-The name Chukma is given to this tribe in general by the inhabitants of the Chittagong District, and the largest and dominant section of the tribe recognizes this as its rightful application.[২০] সাক বিষয়ে লে. জেনারেল স্যার আর্থুর পি. ফেইরি তাঁর ÔHistory of Burma গ্রন্থে যে বিবরণ তুলে ধরেছেন সেটিও যথার্থ মনে হতে পারে-The Indian settlers no doubt, in a few generations, became merged in the mass of Mongoloid tribes whom they found in the country. Only three names have been handed down as borne by original tribes, or the first conjunctions of such tribes-that is, Kanran, Pyu or Pru and the Sak or Thek. The last however, is not an original native term, but provably an abbreviation of Sakya----.আরাকানিজরা শাক্যদেরকে থেক বা সাক বা থেট নামে অভিহিত করেছিলেন এটি পরিষ্কার। যামিনী রঞ্জন চাকমা'র মতে-আরাকানের লোকজনেরা জানতো বিজয়গিরি ছিল শাক্য জাতির লোক। তারা তাদেরকে তাই বলতো শাক বা শাহ্। ----------বর্তমান কালেও চাকমারা বোমাং সার্কেলের (বান্দরবান জেলা) নিরক্ষর মার্মাদের কাছে 'শাহ্' নামে পরিচিত।[২১] এ শাহ্ শব্দটিও নি:সন্দেহে শাক্য শব্দের বিকৃত উচ্চারণ। মারমা ও আরাকানের লোকেরা রাজাকে 'মাং' বলে থাকেন। অনেকে মনে করেন, রাজা বিজয়গিরি আরাকানের লোকেদের কাছে 'সাকমাং অর্থাৎ শাক্যরাজা বলে পরিচিত ছিলেন। এ সাকমাং শব্দটির উচ্চারণ বিকৃতি অর্থাৎ উচ্চারণ দোষে 'অনুসার'টি বাদ যাওয়ায় শব্দটি 'সাকমা' হয়ে যায়। কালে কালে এ বানানটি 'চাকমা' হিসেবেই লেখা হচ্ছে। সুতরাং চাকমা ইতিহাসে যত তথ্য ঘাটতি থাকুক না কেন আমাদেরকে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হবে যে, শাক্য শব্দ থেকে অধূনা চাকমা শব্দটির ব্যুৎপত্তি তথাপি চাকমা জাতির উদ্ভব।

আবার অনেকের মতে, গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবস্তু ছাড়াও সে সময়ে শাক্যদের বেশ কয়েকটি স্থানের নাম জানা যায়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চাতুমা[২২], সায়গাম, খোমদুস্‌স, মেদহুম্প, নংগর, দেবদহ ইত্যাদি। ঐ সময়ে ১০টি শাক্য বংশের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করা হয়। সেগুলে হচ্ছে- বৃজি, লিচ্ছবি, চাতুমা, সামগম, উলুম্পা, দেবদহ, সক্কর, শীলবতী, খোসদুস্‌স এবং বিদেহ।[২৩] আসলে চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের কেবল শাক্যবংশীয় বলে পরিচয় দিলেও তাঁরা ছিলেন 'চাতুমা' গোষ্ঠীর লোক। এই চাতুমা শব্দটি ধ্বনি বিবর্তনের কারণে চাঙমা হওয়া স্বাভাবিক[২৪]। শব্দগত যা-ই মিল-অমিল থাকুন *না কেন চাকমা নামকরণের বিষয়টির সাথে* চাকমা জাতির উদ্ভবের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত বলে মনে হয়।

পরিচিতি : *শুভ্র জ্যোতি চাকমা, রিসার্চ অফিসার, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি।* *shuvrachakma71@gmail.com*

লালন কান্তি চাকমা

ফটোগ্রাফ

পিতা- মৃত সুরেন্দ্র লাল চাকমা মাতা-মৃত বিরাজ মুখী চাকমা। ১৯৬৯ সালে খাগড়াছড়ি জেলাধীন দিঘীনালা উপজেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম। গ্রামীন জনপদে বেড়ে ওঠা এক মুক্ত চিন্তার ফেরিওয়ালা। সাম্প্রদায়িক ঘুর্ণিবাত্যার অসহিষ্ণু পরিবেশে শৈশব কৈশোর জীবন কেটেছে। পড়াশুনা ও পেশা সূত্রে থেকেছেন খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি,বান্দরবান ও ঢাকা শহরে। সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসএস (অনার্স) ও এমএসএস ডিগ্রি নিয়ে প্রথমে উন্নয়নকর্মী হিসেবে আইডিএফ সংস্থায় দুই বছর কাজ করার পর বর্তমান সময় পর্যন্ত কাচালং সরকারি কলেজে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

আগাগোড়া মানবতায় বিশ্বাসী। শ্রেণি বৈষম্যহীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা তাঁর স্বপ্ন। প্রিয় ব্যক্তিত্ব ভুপেন হাজারিকার লিখিত বই"আমি এক যাযাবর" তাঁর নিত্য সঙ্গী।

''আরাঙ"(একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন) এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও চাকমা সাহিত্য বাহ্ এর উপদেষ্টা সদস্য। মননশীল সাহিত্য প্রেমিক হিসেবে কবিতা তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। দেয়ালিকা,সাময়িকী, বার্ষিকী, দৈনিক পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে সাহিত্যে হাতে খড়ি।

নং- ০২ : প্রসংগঃচর্তুভুজ রাজনীতি তত্ত্ব , গ্যাঁড়াকলে পার্বত্য শান্তি চুক্তি

প্রথমেই সবিনয়ে স্বীকার করে নিই যে, রাজনীতি বিষয়ে পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করার মত একাডেমিক অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা কোনটিই আমার নেই। তবে সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে বিদ্যমান সমাজ বাস্তবতা বিষয়টির প্রতি আমাকে কৌতুহলী করে তোলে। বলা যায়, আমার পারিপার্শ্বিক সমাজচিত্র ও সমকালীন রাজনীতির প্রভাব এবং এই বিষয়ে কিছু সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের তাগিদ থেকেই বর্তমান নিবন্ধের উপর আমি আমার নিজস্ব কিছু মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সেই সঙ্গে এইসব জটিলতর সমস্যা থেকে উত্তরণে আশু করণীয় বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত পরামর্শও রাখার চেষ্টা করবো।

লেখার শুরুতেই বিষয় বস্তুর আলোকে বলে রাখি যে, চতুর্ভুজ রাজনীতি তত্ত্ব বলতে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের বিবদমান চারটি রাজনৈতিক দল ও তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে বোঝানো হয়েছে। "পার্বত্য শান্তিচুক্তি বলতে ২রা ডিসেম্বর' ৯৭ বাংলাদেশ সরকারের সাথে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল জেএসএস-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত "পার্বত্যচট্টগাম চুক্তি"কে বোঝানো হয়েছে। কথিত এই চুক্তির ফলে দীর্ঘ তিন দশকেরও অধিক সময় ধরে অধিকারের প্রশ্নে সংগ্রামরত জেএসএস দলের সশস্ত্র আন্দোলনের অবসান হয়। চুক্তির আগে ও চুক্তির সময়কালীন একমাত্র আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসেবে যেহেতু জেএসএস নেতৃত্ব দিয়েছিল তাই স্বাভাবিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল নাগরিকের পক্ষে চুক্তির প্রধান দায়িত্ব জেএসএস পালন করেছিল যদিও চুক্তির সময়কালীন একই ইস্যুতে অনেকটা একই প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসা ইউপিডিএফ কালো পতাকা প্রদর্শন করে কেবল চুক্তির বিরোধিতা নয় একটি নতুন রাজনৈতিক দলেরও আত্মপ্রকাশ ঘটায়। তাদের মতে চুক্তির মাধ্যমে জুম্ম জনগোষ্ঠীর খন্ডিত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র, যা মানা যায় না। বিপরীতে, তারা পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ বরাবরই আঞ্চলিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল ছিল যা এখনো দৃশ্যমান। স্বাভাবিক কারণে সাধারণ জুম্ম জনগণের প্রত্যাশা ছিল চুক্তির মাধ্যমে তাদের হারানো অধিকারের কিছুটা হলেও ফেরত পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে, ইউপিডিএফ দলের দাবি হলো তারা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চায়। আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটা চুক্তির মাধ্যমে জেএসএস যেমন সীমিত স্ব-শাসনের অধিকার লাভ করেছিল ঠিক অনুরূপভাবে ইউপিডিএফও যদি ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করে নিতে পারে তাহলে তো আরও উত্তম। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকারহীন চির-নির্যাতিত জুম্ম জনগণতো সেই অধিকারের প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষায় থেকেছে দিনের পর দিন।

বস্তুত, আশা-নিরাশায় ভরা আমাদের"শান্তি চুক্তির" এই পথ চলা। নাটকের নাটকীয়তার আলোচনা যেমন মানুষের মুখে মুখে ফেরে ঠিক তেমনি"শান্তি চুক্তি"র নাটকীয় অর্জন নিয়ে দেশ ও বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হলে জাতিসংঘের ইউনেস্কো তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশ্বনন্দিত "ইউনেস্কো শান্তি" পুরষ্কারে ভুষিত করেছিল। যদিও অদ্যাবধি

'শান্তি' নামক কথিত সেই সোনার হরিণ এখনও অধরাই রয়ে গেছে। বিপরীতে, উভয়দল তাদের ঘোষিত লক্ষ্যবস্তু থেকে সরে এসে পারস্পরিক সংঘাতে মেতে ওঠে। ফলশ্রুতিতে কথিত আঞ্চলিক রাজনৈতিক (চার) দলের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের ফলে উভয় দলের বহু সম্ভাবনাময় নেতাকর্মীসহ অনেক নিরীহ সাধারণ মানুষ প্রাণ হারায়। এই মৃত্যুর মিছিল থেকে শিশু পর্যন্ত বাদ যায়নি। যুদ্ধ মানে তো মানবতাকে হত্যা করা। কবি নির্মলেন্দু গুনের ভাষায় বলতে হয় " যুদ্ধ মানে শত্রু শত্রু খেলা, যুদ্ধ মানে আমার প্রতি তোমার অবহেলা।" (প্রেমাংসু রক্ত চাই নির্মলেন্দু গুণ) স্বভাবতই যুদ্ধের এই ঘুর্ণিবাত্যা দলের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ রইল না। এক পর্যায়ে মূল জেএসএস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নুতন জেএসএস (এমএন লারমা, দেখুন, কর্মী সম্মেলন দিঘীনালা ঘোষনা,১০ এপ্রিল ২০১০ খ্রি:) নামে তৃতীয় দলের সৃষ্টি হল। একইভাবে মূল ইউপিডিএফ দল ভেঙ্গে গণতান্ত্রিক ইউপিডিএফ নামে নতুন একটি দলের সৃষ্টি হল। এই কথিত চার দলের মত, পথের গোলকধাঁধায় পড়ে শতাব্দীর বঞ্চনা নিয়ে জুম্ম জাতিগোষ্ঠীসমূহকে পথ চলতে হচ্ছে।

সুপ্রিয় সুধি/পাঠক, এরকম আরো অনেক চিত্তাকর্ষক খেয়ালি রাজনৈতিক তত্ত্বের কথা বলে নিকট ভবিষ্যতে নতুন কোন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটলে আমাদের অবাক হবার কিছু থাকবে না। এইসব আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে এ পর্যন্ত ০২(দুই) হাজারের অধিক জুম্মজনগন অধিকারের নামে বলি হয়ে গেল, শতশত পরিবারের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে গিয়ে সর্বস্বান্ত হল, অনেকে পঙ্গুত্ত বরণ করে মৃত্যর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। কিন্তু এইসব মৃত্যর বিনিময়ে, জাতির এত বড় ক্ষতির পরও কথিত শান্তিচুক্তি, কথিত পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দেখাতো আমরা এখনো পেলামনা। আর ভবিষ্যতে দেখতে পাবো এমন সম্ভাবনা আছে বলে কোন সাধারণ জুম্ম বিশ্বাস করে না। এই চতুর্ভুজ রাজনীতির মাজেজা পার্বত্য জনগণ আর বুঝতে চায় না। তারা শান্তি চায়। চারটি দলের টানাটানিতে প্রান্তিক জুম্ম জনগণ দৃশ্যতঃ আরো গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে চলেছে।
সুপ্রিয় সুধি,একবার ভাবুন, ০৯(নয়) মাসের মধ্যে যদি একটি দেশের জন্ম হতে পারে তাহলে দুই দশককাল পার হতে চলেছে পার্বত্য চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন হতে পারছে না কেন এর সঠিক জবাব প্রাজ্ঞজনের কাছে রইল। আর চার দলের রশি টানাটনিতে কথিত শান্তিচুক্তির খোলসটাও আদৌ

অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহ জাগে। বিগত সময়ে রাঙ্গামাটির জনৈক এস পি জনাব হুমায়ুন কবির মহোদয় এই পার্বত্য চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঠিকই বলেছিলেন "শান্তি চুক্তি তো একটা মুলা"। তাঁর এই মন্তব্যটি পত্র পত্রিকা সহ সর্বত্রই ব্যাপক প্রচার পেয়েছিল। একই ভাবে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনায় তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব হুমায়ুন কবির খান মহোদয় খেদোক্তি করে বলেছিলেন,"পাহাড়িরা অসহায়, আমি নিরুপায়।"(প্রথম আলো, ৪ঠা সেপ্টেম্বর'২০০৩) সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়ের সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতি হলো পারস্পরিক অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা, জিঘাংসা, সংশয়, সন্দেহ, এলাকা দখলের নামে প্রতিপক্ষের জানমাল ধ্বংস, অপহরণ, গুমহত্যা, প্রতিপক্ষের পরিবারকে ঘরছাড়া করার অসহিষ্ণু জেদ, সাধারণ মানুষকে অন্ধকার জগতে ঠেলে দেওয়ার অসুস্থ ও হিংসাত্মক প্রতিযোগিতা। পাহাড়ের স্থানীয় রাজনীতিতে এই সব নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে আমাদের জুম্ম জনগণের অস্থিত্বকে একেবারেই খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে (অর্থ্যাৎ ভিধে উধোনা)।

আমরা জানি বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে উন্নয়নের রূপকল্প ঘোষণা করে বলছেন যে, আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশ মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন করবে। বাংলাদেশ অবশ্য ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রজন্ম সৃষ্টির জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই জন্য শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। একই দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের পার্বত্য জুম্ম জনগণের মধ্যে উন্নত দেশের অনুরূপ শিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে উঠার কোন আলামত আপাততঃ আমি দেখিনা। তার জন্য প্রয়োজনীয় আয়োজন পার্বত্য চট্টগ্রামের মাঠ পর্যায়ে কোথাও আছে কিনা, থাকলে তা কতটুকু মানসম্মত তার কিছু নমুনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে আমি আমার বর্তমান নিবন্ধের আলোচনা শেষ করব।

সাম্প্রতিককালে, চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব মাহাববুর রহমান মহোদয় সকল কলেজ অধ্যক্ষদের নিয়ে মত বিনিময় সভার আয়োজন করেন। জনাব মাহাবুবুর রহমান মহোদয় স্বাক্ষরিত বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল তালিকা এবং জিপিএ -৫ প্রাপ্ত মেধা তালিকার পরিসংখ্যান একটু খতিয়ে দেখলে পার্বত্য চট্টগ্রামের

শিক্ষার বেহাল দশার হাল নাগাদ চিত্র যে কোন সচেতন অভিভাবককে উদ্বিগ্ন না করে পারবেনা আর এই শিক্ষার ভবিষ্যত পরিণতিই বা কেমন হতে পারে এমন উত্তর পেতে কোন শিক্ষাবিদ হবার দরকার নেই। নিচের সারণিটি দেখুন ঃ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড চট্টগ্রাম ২০১৮ খ্রিঃ সালের এইচ এস সি ফলাফলের তালিকা :

নং	কলেজের নাম	পাসের হার	মোট পরিক্ষার্থী	মোট উত্তীর্ণ
১.	ঘাগড়া কলেজ	৩৩.৮৫%	১১৯ জন	৪০ জন
২.	মহালছড়ি সরকারি কলেজ	২৭.৫০ %	৫৬০ জন	১৫৪ জন
৩.	বাবুছড়া কলেজ	২৬.২৪ %	১৪১ জন	৩৭ জন
৪.	বৌদ্ধ শিশু ঘর হাই স্কুল এন্ড কলেজ	২৫.৭১%	৩৫ জন	০৯ জন
৫.	মানিকছড়ি গিরি মৈত্রী সরকারি কলেজ	২৪.৯৭ %	৯৭৭ জন	২৪৪ জন
৬.	লক্ষীছড়ি কলেজ	২৩.১৯ %	৬৯ জন	১৬ জন
৭.	তবল ছড়ি গ্রীনহিল কলেজ	২২.৩৬ %	২৪৬ জন	৫৫ জন
৮.	বাঙ্গালহালিয়া কলেজ	১৫.৭৩ %	২৬৭ জন	৪২ জন
৯.	পানছড়ি সরকারি কলেজ	১৪.৯০ %	৭২৫ জন	১০৮ জন
১০.	রাজস্থলী সরকারি কলেজ	১৪.৫২ %	২৪১ জন	৩৫ জন
১১.	দীঘিনালা সরকারি কলেজ	৩৫.৮৩ %	১৩৮৭ জন	৪৯৭ জন
১২.	কাউখালী সরকারি কলেজ	৩৬.৩৬ %	২৮৬ জন	১০৪ জন
১৩.	মাটিরাঙ্গা সরকারি কলেজ	৩৬.৮৬ %	৭৭৬ জন	২৮৬ জন
১৪.	রাঙ্গামটি সরকারি কলেজ	৪৫.৮৫ %	১৪১১ জন	৬৪৭ জন
১৫.	রাঙ্গামাটি সরকারি মহিলা কলেজ	৪৭.০১ %	৮৩৬ জন	৩৯৩ জন

১৬.	খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ	৪৭.৪৮ %	১০১৩ জন	৪৮১ জন

এইচ এস সি পরিক্ষা ২০১৮ খ্রিঃ জেলাভিত্তিক জি পি এ -৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা

নং	জেলার নাম	২০১৭ খ্রিঃ	২০১৮খ্রিঃ
১	চট্টগ্রাম (মহানগরী ব্যতীত)	১৩১ জন	১৩৯ জন
২	চট্টগ্রাম মহানগর	১২২৫ জন	১৪২০ জন
৩	কক্সবাজার	০৮জন	০৮ জন
৪	রাঙ্গামাটি	০৪ জন	০১ জন
৫	বান্দরবন	১০ জন	১১ জন
৬	খাগড়াছড়ি	০৪ জন	০৪ জন
	মোট	৩৯১(২.৭৬%)	১৬১৩ (২.৬৫%)

(তথ্যঃ অধ্যক্ষ সভা,তাং ১৫ ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ,চট্টগ্রাম বোর্ড মিলনায়তন।)

এই পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে যেসব কলেজে সবচেয়ে বেশি ফলাফল বিপর্যয় ঘটেছে, এর মূলে কী কী কারণ/দুর্বলতা রয়েছে মাঠ পর্যায়ে তার বস্তুনিষ্ঠ তথ্য জানার জন্য প্রথমে মহালছড়ি কলেজের অধ্যক্ষকে আহবান করা হলে তিনি প্রতি উত্তরে বলেছিলেন, আমার কলেজের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাশে আসে না, শুধু ফরম পূরণের ২ দিন আগে মোবাইলে ফোন করে জানায়, স্যার আমরা এখন ঘরছাড়া হয়ে আছি। আমার ভাই কোন এক আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী হওয়াতে আমাদের সহায় সম্পত্তি সব প্রতিপক্ষের হেফাজতে রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে নিজ জায়গাতে যেতে পারবো সেই সম্ভাবনাও আপাতত: নেই। এখন আমরা এক নিকট আত্মীয়ের পাড়াতে কোনমতে দিনযাপন করছি। বাবার আয়ের একমাত্র উৎস চাষাবাদ। তাও পুরোদমে বন্ধ হয়ে আছে। জীবন যেখানে মৃত্যুর সাথে সতত লড়াই করে সেই রকম অসহিষ্ণু পরিস্থিতিতে আমি কীভাবে ফরম পূরণ করবো জানি না। যদি স্যার আমার প্রতি দয়াশীল হন তবে ফরম পূরণের গুরুদায়িত্ব নিলে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব"। (তথ্যসুত্র-অধ্যক্ষ সভা, প্রাগুক্ত।)

পার্বত্যচট্টগ্রাম এলাকার শিক্ষার ভবিষ্যত নিয়ে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড কতৃপক্ষ ও দেশের গনতন্ত্রমনা সুশীল সমাজ যে উদ্বিগ্ন এই জন্য তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। অথচ আমাদের আঞ্চলিক রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কি রকম শিক্ষা চায়, কিংবা দেশের মুল ধারার সাথে

সমান তালে চলার জন্য কেমন শিক্ষার পরিবেশ দরকার, রূপকল্পে উন্নত দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রজন্ম গঠনে কেমন কর্মোদ্যোগ প্রয়োজন- এ ব্যপারে আদৌ কারো মাথা ব্যাথার কারণ আছে বলে মনে হয় না।

অতএব, উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জুম্ম জনগনের জাতিগত অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একতা শক্তির কোন বিকল্প নেই। প্রসংগতঃ মহামানব গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, সংঘ বা সংগঠনের একতা শক্তি সর্বদাই সুখদায়ক। যখনই সংঘ বা সংগঠনের মধ্যে ভেদ বীজ বপিত হয় তখনই একতা শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। যেই সমাজে ঐক্যের ফাটল ধরে সেই সমাজব্যবস্থার নেতৃত্ব ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ে, দুর্বল সমাজব্যবস্থায় জাতীয় অস্থিত্বের সংকট দেখা দেয়, অস্থিত্ব সংকটাপন্ন জাতির শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, প্রথা, ইতিহাস, ঐতিহ্য অচিরেই ধ্বংস অনিবার্য।

এমতাবস্থায়, এই সমস্যার উত্তরণে আপাততঃ আমরা নির্দিষ্ট কোন এক বা একাধিক কমন ইস্যুতে কাজ করার শুভ উদ্যোগ গ্রহন করতে পারি। ধরা যাক, বিশ্বমানের শিক্ষা বা মান সম্মত শিক্ষা যাই বলি না কেন। যেহেতু উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার জন্য তথা উন্নত দেশের নাগরিক মর্যাদা লাভের জন্য শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন বিকল্প নেই, তাই দেশের মুল স্রোতধারার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষার পরিবেশকে কীভাবে সমপর্যায়ে নিয়ে আসা যায় এমন কর্মোদ্যোগ গ্রহণ অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে।

তাই আসুন,মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান শিক্ষা কর্মসুচীতে অধিক মাত্রায় মেধা, মনন, অর্থ, সময় বিনিয়োগ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য সামাজিক উদ্যোগ গ্রহনে সামিল হই এবং এই রকম সার্বজনীন কর্মসূচিতে সকল স্তরের শ্রেণী পেশার মানুষ যেমনি একত্রিত হওয়ার সুযোগ পাবে তেমনি পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত নবরুপে সুদৃঢ় করার সুযোগও সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

দ্বিধীহীনচিত্তে বলা যায়,শিক্ষায় বিনিয়োগ উন্নত জাতি গঠনের হাতিয়ার। প্রত্যেক পাড়া মহল্লায় যদি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আমলা, অর্থনীতিবিদ, উদ্যোক্তা, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক, চিত্রশিল্পী, নাট্যকার,

আইনজীবি, ব্যবসায়ী তথা বৃত্তিমুলক পেশায় দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তুলতে পারি তাহলে প্রতিটি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্কসের উক্তি এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থা বা মৌলকাঠামো (Basic Structure)। সমাজে এই উৎপাদন ব্যবস্থা বা মৌল কাঠমোর পরিবর্তনের ফলে উপরিকাঠামো (Super Structure)অর্থ্যাৎ অন্যান্য সব কিছু পরিবর্তন হতে বাধ্য।

স্মরণ করা যায়, ১৯৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের নামে তৎকালীন সরকার কাপ্তাই বাঁধ নামে একটি বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যে সময়ে যাঁদেরকে নিয়ে এই উন্নয়ন পরিকল্পনা, তখন পার্বত্য জনগণের এই উন্নয়নকে ধারন করা মত প্রস্তুতি ছিল না। শিক্ষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পিছিয়ে থাকার কারণে এই প্রকল্পের ভাল-মন্দ হিসাব করাও কঠিন ছিল তাদের পক্ষে। ফলে এই প্রকল্প থেকে একটি জাতিসত্বা কীভাবে বেশি মাত্রায় উপকৃত হতে পারে সেরকম সূদুর প্রসারী চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব ছিল বিধায় কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প আজ পার্বত্যবাসীর আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হিসাবে পরিগণিত। প্রায় এক লক্ষ মানুষ নিজ বাস্তু ভিটা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ৫৪,০০০ (চুয়ান্ন হাজার) একর ১ম শ্রেণীর চাষযোগ্য জমি জলমগ্ন হওয়ায় লক্ষাধিক পরিবারের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড তচনচ হয়ে যায়।

তৎকালীন সময়ে চাকমারা কেউই বিশ্বাস করতে পারেনি এতবড় পাহাড়ে বাঁধ নির্মান করে বাঁধ রক্ষা করা যায়। এমনকি চাকমা রাজা বাহাদুর ত্রিদিব রায়কেও খেদোক্তি করতে শোনা যায়, এত বড় বিপর্যয়ের কথা আগেভাগে ধারণা করতে পারলে উনি এই পরিকল্পনায় স্বাক্ষর করতেন না। (দেখুন:- পোত্যআমল-নুঅ পাত্তলী সংঘ)

পক্ষান্তরে, সে সময়কালে যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষিত জনগোষ্ঠী থাকত, অগ্রসরমান মানব সম্পদ থাকত তাহলে কাপ্তাই বাঁধের শক্তিকে পুঁজি করে বহুজাতিক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে বহুগুনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হতো, বিপর্যয় তো দুরের কথা। এই ক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই নাগরিক বান্ধব উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

আসুন, আপাততঃ পার্বত্য জনগোষ্ঠীর জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় দল মত নির্বিশেষে সকলকে এক কাতারে কাজ করার সেতুবন্ধন রচনা করি। মনে রাখতে হবে, শিক্ষা বাঁচলে পরিবার বাঁচবে। পরিবার বাঁচলে সমাজের ভিত আপনাতেই গড়ে ওঠবে। ধর্ম বলি, রাজনীতি বলি, প্রথাগত নেতৃত্ব বলি প্রকৃত শিক্ষায় বিকশিত না হলে সেটি কখনো টেকসই হবে না। যুগে যুগে সঠিক নেতৃত্বের অভাবে আদিবাসী সমাজব্যবস্থা অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। শিক্ষাই কেবল একটি জাতির সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। চর্তুভুজ রাজনীতির ভুল তত্ত্ব নয় বরং ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীর মাধ্যমে প্রত্যেকে প্রত্যেকের পুরিপুরক হয়ে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা এখনো শেষ হয়ে যায় নি। রাজনীতি ময়দানে এমন একটা আপ্তবাক্য বেশ সুবিদিত, তা হলো একজন ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার কারণে কেবল একজন রোগী মারা যেতে পারে কিন্তু রাজা, রাজনীতি,তথা নতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্তের বলি হয়ে একটা জাতিসত্বা অনুরুপ রোগীর মত নিমেষেই ধবংস হয়ে যেতে পারে এটি নিশ্চয়ই কারোর কাম্য নয়। সকলকে ধন্যবাদ।

পরিচিতি : *লালন কান্তি চাকমা, সিনিয়র প্রভাষক, কাচালং সরকারি কলেজ।*

সুমঙ্গল চাকমা

শব্দ, ধ্বনি এবং জ্ঞাতিবাচক শব্দের সাক্ষ্য

ভাষা পরিবর্তনশীল। নদীর মতোই ভাষা তার আপন গতিতে চলে এবং প্রতিনিয়ত তার গতিপথ বদলাতে চেষ্টা করে। ভাষা পরিবর্তন হলেও শব্দের মধ্যে অতীতের ইতিহাস লুকানো *থাকে। সেই হিসাবে শব্দ, ধ্বনি এবং জ্ঞাতিবাচক শব্দ বিষয়ে আমার এই ছোট্ট প্রতিবেদন। লেখার শুরুতে আমার কৈফিয়ত দিয়ে রাখছি যে, শব্দ, ধ্বনি এবং জ্ঞাতিবাচক শব্দ বিষয়ে একাডেমিক বা পন্ডিতি ভাষায় আলোচনা করার মত আমার যোগ্যতা নেই। এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই আলোচনা। সেই সাথে* এই কথাও বলতে চাই, আমার এই আলোচনার মধ্য দিয়ে শব্দ, ধ্বনি এবং জ্ঞাতিবাচক শব্দ বিষয়কে জট বাঁধানোর উদ্দেশ্য নয়, বরং বিজ্ঞজনের সাথে গঠনমূলক আলোচনা করা।

চাকমা ভাষা আর্য ভাষা পরিবারের একটি ভাষা। তাই চাকমা শব্দগুলো সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশের মূল উৎস হতে নানা ভাবে পরিবর্তিত হয়ে চাকমা শব্দে পরিণত হয়েছে। চাকমা শব্দগুলো ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রাথমিকভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১। আর্য শব্দ, ২। ভোট-বর্মী শব্দ ও ৩। বিদেশী শব্দ। ধরা যাক, চাকমা ভাষায় মোট ১০,০০০ (দশ হাজার) শব্দ আছে। এই শব্দ থেকে ভোট-বর্মী এবং বিদেশী শব্দ গুলো বাদ দিই। তারপর আর্য শব্দ থেকে যে শব্দগুলো নানা ভাবে পরিবর্তীত হয়ে চাকমা শব্দে পরিণত হয়েছে সেই সব শব্দগুলোও বাদ দিই। অবশ্য আর্য শব্দ থেকে নানাভাবে পরিবর্তীত হয়ে যে সব শব্দগুলো চাকমা শব্দে পরিণত হয়েছে সেই সব শব্দ মূল ভাষা বংশ ইতিহাস নির্ণয়ের মূল উপাদান। সেই পরিবর্তীত শব্দগুলো বাদ দিয়ে যে শব্দগুলো থাকবে সেই শব্দগুলো হবে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত শব্দ এবং সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত শব্দগুলো চাকমা ভাষায় হুবহু ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু অন্য ভাষায় ব্যবহৃত হয়না। সেই মূল শব্দগুলো হবে জাতির ইতিহাস নির্ণয়ের মূল উপাদান। এ রকম শব্দ চাকমা ভাষায় খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন- স. মাতৃ> প্রা. মাআ> বা. মা, স পোত> প্রা. পোঅ> বা. পো। বাক্য গঠন করলে হবে- মাআ বাজারত যায় অর্থাৎ মা বাজারে যায়। তা পোঅবু লেঘা শিঘে অর্থাৎ তার

ছেলে লেখা শিখে। স. ভ্রাতৃক> প্রা. ভাইঅ> বা. ভাই। চাকমারা খুব আদরের সহিত ডাকলে ভাইঅ বলে ডাকে। স. ভগীনি > প্রা. ভইনী> বা. বোন। বিশেষত বয়স্ক লোকেরা আদরের সহিত ভইনী বলে ডাকে। বাংলার প্রভাবে ভাই-বোন শব্দই ব্যবহার করে। হয়তো হতে পারে ভাইয়, ভইনী শব্দগুলো অচল হওয়ার লক্ষণ। কারণ শব্দগুলো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। স. ধূমক> প্রা. ধুমঅ> বা. ধোঁয়া, স. ধ্বল> প্রা. ধঅল> বা. ধল। এখানে দেখা যাচ্ছে, শব্দগুলো প্রাকৃত। অথচ চাকমা ভাষায় হুবহু ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু অন্য ভাষায় ব্যবহার হয়না। যে সব সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহার হচ্ছে সেগুলো পন্ডিতগণ নাম দিয়েছেন তৎসম শব্দ। হয়তো অনেকে মাআ, পোঅ এই শব্দগুলো বাংলা তৎসম শব্দের হিসাবে গুলিয়ে ফেলবেন। কিন্তু তা কখনো সেই হিসাবে হবেনা। আমরা জানি, মধ্যযুগে ভাষার এক বিশাল সাহিত্য সৃষ্টি হলেও আধুনিক যুগের লেখকরা বাংলা ভাষার সীমিত শব্দ দিয়ে কাব্য চর্চার স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন নি। তারা সংস্কৃত থেকে প্রয়োজনীয় শব্দ নিয়ে কাব্য চর্চা করেছেন। ঊনিশ শতকের শুরুতে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যখন বাংলা পড়ানো হয় তখন সংস্কৃত পন্ডিতদের দ্বারা পাঠ্য পুস্তক লেখানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর ফলে প্রচুর তৎসম শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে। যাদের সাহিত্য রচনায় বাংলা ভাষায় প্রচুর তৎসম শব্দ প্রবেশ লাভ করে তারা হলেন- রামরাম বসু, মাইকেল মধুসূধন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রমুখ। অপরদিকে চাকমা ভাষায় সাহিত্য রচনা হলেও বাংলা তৎসম শব্দের মতো উপরোক্ত শব্দগুলো চাকমা ভাষায় ঢুকেছে তা কোন প্রকারে যুক্তি দেওয়া যায় না। শব্দগুলো ইতিহাস নির্ণয়ের মূল উপাদান হিসেবে যদি দেখি তাহলে ঘটনা হবে এইভাবে- "সূদুর অতীতের সেই দিনের প্রাকৃত ভাষী চাকমা জাতির মুখে মাআ, পোঅ শব্দগুলো আজও বর্তমান"। সেই দিনের শব্দের ধ্বনি শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে চাকমা জাতির ভাষার সমুদ্রের মধ্যে এখনো অবিকৃতভাবে বেঁচে আছে। কথার প্রসঙ্গে একটি ঘটনা না বললেই নয়। ঘটনাটি হলো- ১৯৩৮ সালে কোয়েলাকান্থ নামে একটি মাছ পাওয়া গেছে। এরপর ১৯৫২ সালে। তারপরে ১৯৫৬ সালে পাওয়া যায়। ১৯৩৮ সালে যে মাছটি পাওয়া যায় সেই মাছটি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানতে পারলেন মাছটি যেমন তেমন মাছ নয়- খাঁটি কোয়েলাকান্থ। মাছটি নিদেন-পক্ষে পাঁচ কোটি বছর

আগেকার পৃথিবীর বাসিন্দা। কোটি বছর আগেকার মাছ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবার কথা। আশ্চর্যের বিষয় সমুদ্রের পানিতে এ যেন জীবন্ত ফসিল। মাছটির খবর বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই জানতেন। ফসিল মানে? ফসিল হলো তাই-শিলায়িত দেহাবশেষ বা প্রস্তরীভূত ও কংকাল দেখে প্রাণীর বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং বংশ তালিকা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। ঠিক তেমনি ভাষার ক্ষেত্রে পুরাকালের পুঁথি ও শিলালিপি। পুরাকালের ভাষা এবং আধুনিক ভাষার যোগসূত্র খুঁজে পেলে ভাষার ইতিহাস নির্ণয় করা সম্ভব হয়। সেই হেতুতে চাকমা ভাষা সমুদ্রের মধ্যে মাআ, পোঅ শব্দগুলো জীবন্ত কোয়েলাকান্থ বললেও অযৌক্তি হবে না। কারণ, অতীতে যেরুপ বর্তমানেও সেরুপ।

মাআ শব্দের মতো বাবা শব্দটি বাআ ধ্বণি রুপে উচ্চারণ করে। বাবা একটি তুর্কি শব্দ। বাপ শব্দটি সংস্কৃত "বপ্র"। চাকমারা বাপ শব্দটিও ব্যবহার করে এবং দাদা শব্দটিও দাআ ধ্বণি রুপে উচ্চারণ করে। অবশ্য বাংলার প্রভাবে মা, বাবা, দাদা শব্দগুলো ব্যবহার করে আসতেছে।

ধ্বণি : ভাষা পরিবর্তন মূলত ধ্বণি পরিবর্তন। প্রায় কতগুলো সুনির্দিষ্ট সূত্রের নিয়মে ভাষা পরিবর্তন হয়। তবে গনিত সূত্রের মতো ধ্বণি পরিবর্তন সূত্র খাটেনা। সেজন্য ভাষা পরিবর্তন চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করে। চাকমা ভাষায় ধ্বণি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমার আলোচনা হবে ঘোষীভবন এবং দু' একটি প্রাচীনতার টুকরো টাকরা চিহ্ন নিয়ে। চাকমা ভাষায় যে অঘোষ ধ্বণিগুলো সঘোষ ধ্বণিতে পরিণত হয় সেগুলো হল- ক>গ, খ> ঘ, চ>জ, ত>দ, প>ব .....। যেমন- মকর > মগর, চোখে> চোঘে, নাচে>নাজে, গাছে> গাঝে, পাতা> পাদা, সাপে> সাবে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত শব্দগুলো বুঝার সুবিধার্থে দেওয়া হচ্ছে। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত যে শব্দই হউক না কেন চাকমা ধ্বনিতে উপরোক্ত সূত্রের মাধ্যমে চলে আসবে। আবার, মাজ্যাযুক্ত অর্থাৎ হলন্তযুক্ত অঘোষ ধ্বণিগুলো ক্ চ্,ত্,প্ সঘোষ ধ্বণিতে গ,জ,দ,ব তে পরিণত হয়ে সম্বন্ধ বাচক পদ সৃষ্টি করে। যেমন- থাক্>থাগদে, ভাচ্> ভাজত, আমাত্> আমাদত্, ভাপ>ভাবত। মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে পদমধ্যস্থিত অযুক্ত ব্যঞ্জনগুলো প্রায়ই লুপ্ত হয়। কিন্তু শৌরসেনী প্রাকৃতে তা হয়নি বলে শৌরসেনী ভাষা একটু কর্কশ। অথচ মাহারাষ্ট্রী এবং শৌরসেনী প্রাকৃত ভাষার কাছাকাছি। মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের মতো চাকমা ভাষাতেও পদমধ্যস্থিত অযুক্ত ব্যঞ্জনগুলো লুপ হয় যা উপরের ধ্বণি পরিবর্তন সূত্র দেখে বুঝা যায়।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, চাকমা ভাষার যখন সাহিত্য ভান্ডার পুরিপুষ্ট হবে তখন চাকমা ভাষা উন্নত এবং সু-মধুর হবে।

মাজ্যা যুক্ত অর্থাৎ হলন্তযুক্ত বিদেশী অঘোষ ধ্বণি যুক্ত শব্দ যখন চাকমা ভাষা আপন করে গ্রহণ করে তখন মূল শব্দ রক্ষিত থেকে এবং হলন্তযুক্ত অঘোষ ধ্বণির সূত্রের নিয়মে সেই সব শব্দ সম্বন্ধ বাচক পদ সৃষ্টি করে। যেমন একটি ইংরেজী শব্দ ব্র্যাক> ব্রাগত।
অশোক অনুশাসনের মূল ভাষা হতে চারটি উপভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। ১। উত্তর পশ্চিমা (শাহ্বাজগঢ়ী এবং মানসেহ্রা অনুশাসন), ২। দক্ষিণ পশ্চিমা (গির্ণার অনুশাসন), ৩। প্রাচ্যমধ্যা (কালসী ও ছোট অনুশাসনগুলি) এবং ৪। প্রাচ্যা (ধৌলী ও জৌগড় অনুশাসন)। এই চারটি উপভাষার মধ্যে প্রাচ্যরমধ্যার বিশিষ্ট লক্ষণের মধ্যে, ক্ষ>ক্খ ধ্বনি রুপে পরিবর্তন হওয়া। চাকমা ধ্বনিতেও একই রুপ। যেমন- দৃক্ষতি>দক্খতি, যক্ষ>যক্খ। প্রাচ্যামধ্যার প্রাচীন নিদর্শন দিল্লী তোপরা স্তম্ভলিপির সপ্তম অনুশাসন। উল্লেখ্য যে, মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, মাগধী ও পৈশাচীর মূলে হয়ত একদা ছিল যথাক্রমে দক্ষিণপশ্চিমা, মধ্যাপ্রাচ্যা এবং উত্তরপশ্চিমা। তবে এসব ভাষা সভা-সাহিত্যের ভাষা ছিল। আবার জৈনদের বেলায় এসব যুক্তি খাটেনা। সে যাহোক চাকমা ভাষাতে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষার ছাপ সুস্পষ্ট। সে কারনে ক্ষ>ক্খ ধ্বনির প্রভাব চাকমা ভাষায় পড়েছে।

ঠিক তেমনি ভৌগলিকভাবে যতই দূরত্ব হউক না কেন কোন ভাষা অথবা উপভাষায় কোন একটি বিশেষ শব্দ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। সে সব শব্দকে পন্ডিতি ভাষায় বলা হয় সমশব্দ-গন্ডীরেখা (Isogloss) বলে। যেমন একটি চন্দ্রবাচক শব্দ। কাশ্মীর, নেপাল, গাড়োয়াল এরা সবাই "জুন" বলে। আবার অসমীয়া ভাষায় "জোন" বলে। চাকমা জাতিরাও জুন বলে। এই শব্দগুলো সংস্কৃত শব্দ "জ্যোৎস্না" হতে আগত। কাজেই দেখা যাচ্ছে চাকমা ভাষায় জুন শব্দটি অসমিয়া ভাষা থেকে ঋণকৃত নয়। হয়তো হতে পারে কাশ্মীর, নেপাল এবং গাড়োয়াল ভাষা থেকে ঋণকৃত অথবা সে সব জাতিরা চাকমা থেকে ঋণ করেছেন। চাকমা জাতির জন্য এই "জুন" শব্দটি পরিষ্কারভাবে ইতিহাসের পথ খুলে দেয়। কারণ শব্দ এমনি আসেনা। শব্দটি যদি ঋণকৃত শব্দ হয় অথবা চাকমা জাতির থেকে ঋণ শব্দ হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে বলা যায়, যে জাতি থেকে "জুন" শব্দটি গ্রহণ করেছে সেই

জাতির সাথে অতীতে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ছিল অথবা ভৌগলিকভাবে একি জায়গায় বসবাস করেছিল।

ভাষা বিহীন লিপির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ভাষা ছিল বলে লিপির জন্ম হয়েছিল। তৎসময়ে চাকমা ভাষা ছিল বলে প্রাক চাকমা লিপি, প্রাচীন চাকমা লিপি এবং আধুনিক চাকমা লিপির জন্ম হয়েছিল। কলিঙ্গ, পল্লব, ও চালুক্য সাম্রাজ্যে ৬৫০ খ্রি: সময়ে প্রাক চাকমা লিপির উদ্ভব এবং দিনেশ রত্ন প্রভাকর সিদ্ধার্থ মহাশয় তার "চাকমা ভাষা গবেষণা ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন ১" বইয়ে প্রাচীন চাকমা লিপি ৭০০-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে গৃহীত হয় বলে ধারণা করেন। পালি ভাষার মতো চাকমা ভাষাতেও শ,ষ,স এই শিষ ধ্বনির পরিবর্তে চাকমা ভাষাতে সর্বদা "স" হয়। অশোক কুমার দেওয়ান মহাশয় চাকমা জাতির উদ্ভবকাল এর উদ্ভবস্থল সম্পর্কে অনুমান করেন- "চাকমা ভাষায় চর্যাপ্তীয় যুগের বঙ্গ-কামরুপী ভাষার কিছু লক্ষণাদি বিদ্যমান। তদুপরি এর উপর শ্রীহট্ট, আসাম ও উত্তর বঙ্গীয় আঞ্চলিক ভাষার যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উপরোক্ত লক্ষণাদি বিচার করে দেওয়ান মহাশয় চাকমা জাতির উদ্ভবকাল এবং উদ্ভবস্থল মনে করেন দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। তিনি ভাষা বিচার করে চর্যাপদ থেকে কয়েকটি পদ রেফারেন্স দিয়েছেন। তবে তার রেফারেন্স কিছুতা সত্য। তার দেয়া রেফারেন্স থেকে কয়েকটি পদ ধ্বনি বিচারে বিচার করা যাক। চর্যাগীতের একটি পদ :

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী। দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।।

(চাটিল্লপাদ)

প্রাচীন বাংলায় "চিখিল" শব্দের অর্থ কাদা। পালি এবং অর্ধ মাগধী প্রাকৃতে "চিক্খল্ল"। শব্দটি চাকমা ভাষায় "চেগলক"। 'চিখিল' শব্দের 'খ' ধ্বনিটি অঘোষ ধ্বনির মহাপ্রাণ। 'চিক্খল্ল' শব্দের 'ক' ধ্বনিটি অঘোষ ধ্বনিটি অল্পপ্রাণ। এবং 'চেগলক' শব্দের 'গ' ধ্বনিটি সঘোষ ধ্বনির অল্পপ্রাণ। কাজেই দেখা যাচ্ছে পালি এবং অর্ধ মাগধীর 'ক' ধ্বনি অঘোষ ধ্বনির অল্পপ্রাণ এবং চাকমা 'গ' ধ্বনি সঘোষ ধ্বনির অল্পপ্রাণ। অর্থাৎ দুটো ধ্বনি অল্পপ্রাণ। শুধুমাত্রে চর্যাপদীয় 'খ' ধ্বনি অঘোষ ধ্বনির মহাপ্রাণ। সুতরাং ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মে 'চিক্খল্ল' থেকে 'চেগলক'(চিক্খল্ল >চেগলক) হওয়ারই যুক্তিযুক্ত।

দুলি দুহি পীঢ়া ভরণ ন জাই।

রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই ॥ (কুক্কুরীপাদ)

গাছ অর্থে 'রুখ'। পালিতে 'রুক্ষ' চাকমা ভাষায় ঘন গাছ অর্থে রুক্খেং। শ্রদ্ধেয় দেওয়ান মহাশয় তার বইয়ে লিখেছেন 'রুখ্যাং'। মাজ্যা পাত নিয়মানুসারে চাকমা বর্ণে রুখ্যাং লেখা যায়না। শব্দটি চাকমা বর্ণে লিখলে রুক্খেং/রুক্খ্যাং হয়। কাজেই রুক্খেং শব্দটি পালি থেকে আগত (রুক্ষ>রুক্খেং), চর্যাপদীয় রুখ্ থেকে নয়। নির্দ্ধিধায় বলা যায় শ্রদ্ধেয় দেওয়ান মহাশয়ের চর্যাপদীয় এই পদ গুলো পরিবেশন করা অপ্রাসঙ্গিক। মহাশয়ের ধারণা কতটুকু যুক্তিযুক্ত চাকমা লিপির উদ্ভব, ধ্বনি এবং শব্দ আমাদের জানান দেয়। আগেই বলা হয়েছিল চাকমা ভাষা ছিল বলেই লিপির জন্ম হয়েছিল। ভাষার গতি স্থির হওয়া মানে ভাষা মরে যাওয়া। তাই চাকমা ভাষা সেই আর্য ভাষা গ্রহণের পর থেকে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষার বুকের উপর দিয়ে বয়ে এসে আধুনিক চাকমা ভাষা। সুতরাং প্রারম্ভিক ভাষা এবং লিপি বাদ দিয়ে তার পরবর্তী ফসিল নিয়ে গবেষণা করা মূখ্য হতে পারেনা তা হবে গৌণ।

চাকমা ভাষা এবং ২য় মধ্য ভারতীয় আর্য-ভাষার অশোক অনুশাসনের ধ্বনি পরিবর্তন হুবহু মিল আছে। তা হলো- ক>গ, প>ব। যেমন- পরলোক>পরলোগ, স্তুপঃ>থুবে। প্রাকৃতের ধ্বনি পরিবর্তন অপভ্রংশেও ঠিকে রইল।

উপরে উল্লেখিত যে সকল প্রাকৃত শব্দের মধ্যে বা অন্তে যে অ ধ্বনি পাওয়া যায় অর্থাৎ ভাইঅ, ধুমঅ, ধঅল এরকম ধ্বনি চাকমা ভাষাতে অনেক আছে। যখন চাকমা সাহিত্যিকরা চাকমা ভাষা বাংলা বর্ণ দিয়ে লিখে তখন অ ধ্বনি নির্দেশের জন্য লোপ চিহ্ন (') ব্যবহার করে। আসলে লোপ চিহ্নের (') পরিবর্তে অ ধ্বনি ব্যবহার করাটাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। এই অ ধ্বনিটি চর্যাপদেও পাওয়া যায়। হয়তো অনেকের প্রশ্ন হতে পারে অ ধ্বনিটি কোন ভাষা থেকে চাকমা ভাষায় গৃহীত হয়। যদি আমরা একটু নিখুঁতভাবে দেখি উপরে শব্দগুলো হলো প্রাকৃত শব্দ সেই শব্দগুলো চাকমা ভাষায় হুবহু ব্যবহার হচ্ছে। কাজেই নির্দ্বিধায় বলতে পারি সেই প্রাকৃত অ ধ্বনি চর্যাপদের ভাষা অতিক্রম করে চাকমা জাতির ভাষায় এখনো ঠিকে আছে। সুতরাং অ ধ্বনি চর্যাপদীয় ভাষা থেকে নয়, প্রাকৃত থেকে।

জ্ঞাতিবাচক শব্দের সাক্ষ্য ঃ আমরা জ্ঞাতি-সম্পর্ক শব্দ ব্যবহার করে লেনদেন, ভাব-বিনিময় ইত্যাদি করে থাকি। জ্ঞাতি-সম্পর্ক শব্দগুলো শুধু এখানে সীমাবদ্ধ নয়। মানব সমাজে জ্ঞাতি-সম্পর্ক পরিবর্তন হয়েছে নানাভাবে। জ্ঞাতি-সম্পর্কে অতীত ইতিহাস লুকানো থাকে। হেনরি লুইস মর্গান ১৫০টি ভাষার সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করেছিলেন। তার পরবর্তী টমসন আরো ১৩০টি ভাষা পরীক্ষা করেছেন। আধুনিক সমাজে মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, মেসো-মাসী, ভাই-বোন, বোনপো-বোনঝি, শ্বশুর-শাশুরী, মামা-মামী ইত্যাদি জ্ঞাতি সম্পর্ক শব্দ আছে। প্রতিটি সম্পর্ক বোঝাবার জন্য প্রতিটি আলাদা শব্দ আছে। কিন্তু আদিবাসিদের ক্ষেত্রে জ্ঞাতি-সম্পর্ক শব্দ থাকলেও আধুনিক জ্ঞাতি-সম্পর্কের মতো বর্ণনামূলক শব্দ মোটেই এরকম নয়। বাবা, জেঠা এবং খুড়ো এরা তাদের সন্তানদের ছেলে বলে ডাকবে কিন্তু ভাইপো বলে আলাদা শব্দ নেই। ঠিক তেমনি ছেলেরাও বাবা, জেঠা এবং খুড়ো তাদেরকে বাবা বলে ডাকবে কিন্তু বাবা, জেঠা এবং খুড়ো বলে তাদের আলাদা শব্দ নেই। অর্থাৎ শুধু নিজের সন্তানকে ছেলে বলবেনা ভাইয়ের ছেলেদেরও ছেলে বলবে তাই ভাইপো বলে আলাদা শব্দ নেই। ছেলেরা ও নিজের বাবাকে বাবা ডাকবেনা, জেঠা-খুড়োকেও বাবা ডাকবে। জেঠা-খুড়ো বলে আলাদা শব্দ নেই। মায়ের বেলাতেও একি রকম। মায়ের সমস্ত বোনকেও মা বলে ডাকবে। চাকমা জাতির বেলাতেও এই রকম প্রাচীন জ্ঞাতি-সম্পর্ক শব্দ এখনো ঠিকে আছে। সেহেতু চাকমা জাতিরা প্রাচীন জ্ঞাতি-সম্পর্ক খাটিয়ে আধুনিক জ্ঞাতি সম্পর্কে উঠতে পারেনি। চাকমাদের বেলায় দাদা বলতে বাবার বাবাকে এবং মায়ের বাবাকে দাদা বলে ডাকে। নানা বলতে আলাদা শব্দ নেই। ঠিক তেমনি দাদী বলতে বাবার মাকে এবং মায়ের মাকে দাদী বলে ডাকে। কিন্তু নানী বলতে আলাদা শব্দ নেই। এই হিসাবে বুঝা যায় চাকমা জাতি কতটা প্রাচীন।

পরিশেষে আমার এই প্রতিবেদনে যে শব্দগুলো নিয়ে অবতারনা করেছি সে সব শব্দ মাত্র দু-একটি। অবশ্য দু'একটি শব্দ দিয়ে ইতিহাস রচনা করা যায় না। তথাপি এ কথাও ভেবে দেখা উচিত যে, শব্দগুলো বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থার মাধ্যমে ইতিহাস রচনায় কতটুকু জর্জরিত এর অবস্থানে আছে। চাকমা জাতির ইতহাসকে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন মত দিয়েছেন। সেই বিভিন্ন মত থেকে উত্তরনের জন্য একমাত্র সম্ভব ভাষাতত্ত্ব এবং লিপির সঠিক ইতিহাস

উদ্ধার করতে পারলে। চাকমা জাতির কাছ থেকে অন্য কিছু হারিয়ে গেলেও ভাষা এবং লিপি এখনো লুপ্ত হয়নি।

ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন সমস্যার কারণে আমি তেমন কাজ চালাতে পারিনি। ব্যাপকভাবে কাজ চালালে হয়তো অনেক শব্দ বেরিয়ে আসবে। তাই উত্তর পুরুষের প্রতি আহ্বান ভাষাতত্ত্ব এবং লিপি নিয়ে গবেষণা করে জাতির সঠিক ইতিহাস উদ্ধার করবেন।

সহায়কগ্রন্থ ঃ

১। সুকুমার সেন ঃ *ভাষার ইতিবৃত্ত, কলকাতা* **১৯৩৯**

২। অতীন্দ্র মজুমদার ঃ *ভাষাতত্ত্ব, কলকাতা-* **১৯৬১**

৩। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রমাকৃষ্ণ মৈত্র ঃ *পৃথিবীর ইতিহাস, বাংলাবাজার-২০১৫*

৪। বিজয়গিরি চাকমা, দিনেশরত্ন প্রভাকর সিদ্ধার্থ ঃ *চাকমা ভাষা গবেষণা ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন* **১**, *বাংলাদেশ রাইটার্স গিল্ড-* **২০১৬**।

৫। মিথুন চাঙমা, ইত্তুকগুল চাঙমা ঃ *চাঙমা শিক্ষা বই, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাস্থ "চাঙমা বর্ণমালা ও ধ্বনি সংক্রান্ত পর্যালোচনা কমিটি"র* **২১** *জানুয়ারী ২০১৭ খ্রিঃ গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি পাঠ্য বই।*

৬। অশোক কুমার দেওয়ান ঃ *চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার ২য় খন্ড, ঢাকা-* **১৯৯৩**

৭। *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ২০১০

৮। সুগত চাকমা : *বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি- ২০০২।*

৯। *গুগল।*

পরিচিতি : সুমঙ্গল চাকমা, উদীয়মান কবি, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি।

ইয়াংঙান ম্রো

লোভের পরিণাম

এক গভীর জঙ্গলে একটি সরোবর ছিল। সেই সরোবরে অনেক ব্যাঙ বাস করত। তাদের ছিল এক রাজা। এক রাজা মারা গেলে আরেক রাজা নির্বাচিত করত। রাজা যে রকম বলবে তারা সকলেই সেই রকম করত। বাইরে থেকে কোন শত্রু আসলে সকলেই মিলে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত। তাতে রাজা নেতৃত্ব দিত। সেই জঙ্গলে একটি বিরাট বড় অজগর সাপ বাস করত। অজগর ঐ সরোবরের ব্যাঙ খাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করত। কিন্তু ব্যাঙদের একতা কাছে সব সময় হার মানতে বাধ্য হত। একদিন সে ঐ সরোবরে গিয়ে ব্যাঙ খেতে চাইলে ব্যাঙরা এক হয়ে অজগরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগল। এতে অজগর পিছু যেতে বাধ্য হয়। কোন রকম পালিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল। আহত অবস্থায় অজগর কি করা যায় তা সর্বক্ষণ ভাবতে *থাকে। কিন্তু কোন পথ* পেত না। বিরাট এক অজগরকে হারাতে পেরে ব্যাঙরা আনন্দে লাফাতে থাকে। কিন্তু তাদের রাজা ছিল অতি বৃদ্ধ। তাই একদিন সে মারা যায়। নতুন এক রাজা বাছাই করা হল। একদিন নতুন রাজাকে একা পেয়ে বিরাট অজগর নানা প্রশংসা করে বলতে লাগল। অজগর বলল, আপনি এত অল্প বয়সে কিভাবে রাজা হলেন। সেই ব্যাঙ রাজাকে জঙ্গলের সকল জীব-জন্তু সম্মান করা উচিত বলে জানাল। আপনি শুধু ব্যাঙ রাজা নয়, বরং জঙ্গলের সমস্ত জীব-জন্তুর রাজা বলে প্রশংসা করতে লাগল। এতে নতুন ব্যাঙ রাজা খুবই খুশী হলো। এমনি করে যখন রাজা বের হয় তখন বিরাট অজগর তাকে এমন করে প্রশংসা করতে *থাকে। একদিন অজগর নতুন ব্যাঙ রাজাকে অতি সম্মানের সাথে* তাকে তার মাথা রাখলো। তাকে বলল, এত বড় রাজা হয়ে কেন হাটতে হবে! রাজাদেরতো অন্যদের উপর বসে চলাফেরা করতে হয়। তাতে স্বার্থপর ব্যাঙ রাজা খুশী হয়ে তার উপর বসতে লাগল। এমনি করে থাকতে থাকতে একদিন বিরাট অজগর ব্যাঙ রাজাকে বলল, মহারাজ, আপনাকে মাথায় নিয়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হয়। কারণ আমার কোন খাবার নেই। আমি না খেয়ে আপনাকে মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছি। ব্যাঙ রাজা বলল, তবে কেন খাবার খেলে না! অজগর বলল, এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায় আর খাবার পাব! এই বৃদ্ধ বয়সে কিভাবে খাবার সংগ্রহ করবো! যুবক বয়স হলে জঙ্গলের কোন খাবার

অভাব ছিল না। ব্যাঙ রাজা বলল, তাহলে আমাদের সরোবর থেকে ব্যাঙ খেতে পারবে? অজগর তার কথায় খুশী হলো। সে বলল, অবশ্যই পারব। সে দিন থেকে অজগর সরোবর থেকে প্রতিদিন ব্যাঙ খেতে লাগল। আর ব্যাঙ রাজাকে তার মাথায় নিয়ে কোথাও যেত। পুকুরে ব্যাঙরা প্রথম প্রথম তাকে এমন না করতে বলে। কিন্তু ব্যাঙ রাজা তাদের কথায় কোন কান দিল না। অজগর সরোবরের ব্যাঙ খেতে খেতে সব ব্যাঙ শেষ করে ফেলল। সরোবরে আর একটি ব্যাঙও অবশিষ্ট থাকলো না। একদিন অজগর ব্যাঙ রাজাকে বলল, মহারাজ, সরোবরে আর কোন ব্যাঙ নেই। এখন আপনি ছাড়া আর কেউ থাকলো না। এখন আপনাকে খেতে হবে। ব্যাঙ রাজা বলল, কেন আমাকে খাবে! আমি তোমাদের রাজা! অজগর বলল, কেন মহারাজ! খাবারকে খেতে হয়। রাজা হোক আপনি যে আমাদের প্রিয় খাবার ব্যাঙ! আপনি নিজের সুখের জন্য সরোবরের সমস্ত ব্যাঙ আমাকে খেতে দিলেন। সুয়োগ পেলে আমাকেও মেরে ফেলবে। এমন স্বার্থপর মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। নিজের সুখের জন্য যারা নিজের জাতি, নিজের স্ত্রী, নিজের সন্তানদেরকে মেরে ফেলতে পারে তারা সয়োগ পেলে যে কোন লোককেও মেরে ফেলতে পারে। তাদের কাছে কোন চেতনা আর মনূষ্যত্ববোধ নেই। তাদের কাছে জাতি, সন্তান আর স্ত্রীদের ভালবাসা নেই। নিজের স্বার্থ তাদের কাছে সব থেকে বড়। নিজের জাতি, গোষ্ঠি, নিজের ছেলে-মেয়ে আর নিজের স্ত্রীকে আপনি আমাকে খেতে দিয়েছেন। এখন আমি আপনাকে খেয়ে ফেলবো। আমি আপনাকে খেয়ে আমার ক্ষুধা মিটাবো। আপনাদের লোক আপনাকে কত বিশ্বাস করে রাজা নির্বাচিত করেছেন। আর আপনি, নিজের সুখের জন্য তাদেরকে আমার কাছে মরতে দিলেন। আপনি জাতি কুলাঙ্গার। আপনি নিজ জাতি লোকদের সাথে বেঈমান করেছেন, নিজ জাতি লোকদের সাথে প্রতারণা করেছেন। আপনার মত ঘরের শত্রু লোক বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এই বলে সে ব্যাঙ রাজাকে গিলে ফেললো। অজগর অতি আনন্দে ব্যাঙ রাজাকে খেতে লাগল। সরোবরের ব্যাঙগুলোকে খেয়ে শেষ করে দিল। একদিন সে মনের আনন্দে সে স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে গেল।

পরিচিতি : ইয়াংঙান ম্রো, বিশিষ্ট লেখক, বান্দরবান।

Kuldip Roy
Looking back on Cloudy Mountain

Few years back, there was an opportunity to translate some Chakma poems in English by one of the famous poets of Chakma literature. Somehow my effort did not see the ray of light but this second opportunity arose rather unexpectedly. The book itself had been a milestone as it was the first book published on Chakma script, Bangla script and translation in Bangla. This writing will focus on the poems of the book named "Cloudy Mountain" which was published in 2012.

Our honorable poet is an avid lover of Chittagong Hill Tracts life, nature and culture. We see the reflection of it throughout these poems while he addresses themes such as – Jum or shifting cultivation, culture, nature and wildlife, history, patriotism, romanticism, political condition, optimism and religion. Jum cultivation is an integral part of CHT life. Poet vividly draws the picture of it from the beginning to harvest. In the poem "Satisfaction at heart" we see-

"The plants will be seeded after first rain of Boisakh month

Forest will be cleared for Jum cultivation by using 'Kullayang'[1]

The time for cultivation is coming with an eagerly heart

Life's merriment is coming out profusely"

He is reminding his beloved in the poem "Waiting for Beloved" about-

"There was a commitment between us that you will come

We will catch fish and crab from the waterfall of mountain

We will pick cucumber and chinar of jum harvest

And eat inside a cottage roofed with straw and dry leaves"

The scenario of jum is alive with lines from the poem "Cloudy Mountain"

"Shimul tree's cotton will play hide and seek among the clouds

Mountains will burst out laughing with Maleya"[2]

Moreover, he is also searching solace in nature,

“If hard time comes go back to jum

Amidst ripened paddy you will find chinar marfa[3]

Pumpkin, amilagulo[4]- dumor sumi[5]- are scattered here and there”

(If hard time comes”)

Nature and wildlife are other dominant aspects of our distinguished poet which is evident in the same poem through the lines – “Sonatalli[6] birds chirping sound will be echoed throughout the forest and Ghudhum fishes will float above water, then you will remember me once more.” Life and nature cycle is interrelated with lines like “The green leaves return to life after listening to the sweet song of Kokil bird, Crocodile becomes visible through the calling of Sea gull; old folks are preparing rice in the full moon night.” (“No one called but still”) Furthermore, nature’s beauty is highlighted once again -

“Parrot bird’s have become restless in deep forest

Moonlit night has appeared over Pizhum[7] bamboo

I have been looking from the channah[8] with advancing hands” (“Waiting for beloved”)

Prominent personalities and cultural figures of past were mentioned in the poem “Cloudy Mountain” with their significant contribution like what was the identity of Shivcharaon, roaming around different mountains by Runu khan dewan(Rebel fighter against British colonization), Nuoram had given life to Chakma alphabet, Tanyabi and Chandobi (romantic heroine of Chakma literature) had spread love, Radhamon and Dhonpudi’s true love tale, Nilambor chakma contributed in composing tune and music of Ubogid and Genghuli along with Ronjit dewan’s expression of modern chakma songs, History of Chakma had been written by Biraj Mohon Dewan and Krishna Kishor Chakma had enkindled the light of education and lastly Suhrid Chaklma showed the root of literature, Poet is very ecstatic to know about his beloved’s arrival and ready to tune the dudhuk and hengrong but on the other hand, he is conscious that now a day’s Dinaram Genghuli’s

strings of dotara are not making sound properly whereas Modonpohr's string's are torn apart from dotara. ("Teh Uddel") He is also reminding us about our Vaidya[9] in the poem "You can know me if you want"-

"If the world becomes tiny you will find worm eaten bag

Is left thrown by an incantation with palm leaves tabize[10]

Into the bond of Abedi[11] cotton"

Mother of Pattori is an interesting character for not only the subject she bears but our poet has also written two poems focusing on her life which is an only example from this book. In "Pattorima's heart aches" we find her wandering through streets of Rangamati where no one listens to her words as everyone is busy with their own life and that is one of the common characteristics of modern times. She does not know where to go as she is the victim of communal riots where she had lost her near and dear ones.

The poet writes,

"Baghaihat, Gongaram is burning
Affected people of Khagrachori fled inside deep forest
If anyone slips then they are embracing the risk of becoming disabled"

"Pattorima's heartache"

Pattorima hits her head to the electricity post and laments about the wishes of late husband who expressed his desire to put a banana garden on the southern side, to build an 'Ezor'[12] on northern side, sanko[13] on eastern side, a chicken house on western side which is a typical picture of a jumma house in a village. Next poem, "Sleeping Pattorima" we find her in different situation where she is tired, maybe wounded and moving relentlessly in the forest; she was attacked by the poisonous small ants like Hutpipra and Deyya[14] she had become the food of birds like sparrow and Ugoric[15] and it's a mystery whether she survives this dire situation or die in helpless condition. In addition to that Karnaphully River is crying as it had submerged almost two thirds of productive land while building a hydro electric dam on Kaptai Lake in 1960 and therefore became the everlasting tale of

grief and nostalgia for jumma people who also witnessed inundation of Chakma palace. Poet boldly writes;

"Tears rolling down continuously from the eyes of Karnaphully

Villages were destroyed and abandoned

Beheaded trees with roots are silent witness

Hills are tortured and on the verge of decline

Veins of heart are agitated with severe pain"

"Karnafully River weeps"

This is only one side of the story and other side consists of Jummo freedom fighter's patriotism in our liberation war. The poem "Mountain of '71" we see that historical Khudiram, Suryasen, Pritilata are awake along with the last independent Nawab of undivided Bengol Nawab Sirajudoulla to break the shackles of oppression. Tikkah khan's tail has fallen; Julfiqur Ali Bhutto fled with garland of defeat and Sheikh Mujib trembles with emotion and declared those two unforgettable as well as historic lines. This declaration of independence reverberates through the hills with "Left.....right" marching sound. The poet reiterates the fact that we will not forget those who had laid down their lives for country's freedom.

The poet is not hesitating to spread the principle of Buddhism in his poem "We are Buddhists" he states that Buddhists seek the road of Nirvana, keeping in mind the principle of Buddha, control their mind's from evil, restraint themselves from speaking bad words. Another poem is based on Bishakha who is a famous female devotee of Bhaghaban Budhha.

Nature is portrayed as mother in the poem "Padmavati" where it advises us to be happy with what we have; it is also expecting that mankind will awake from these careless and self-destructive activities. "Language of both hands" signifies an allegorical meaning because here the poet personifies the fingers that want to shout but cannot do it and the fingers are taunting each other for unidentified reason which may be an indication of fratricide. The poet once again returns to nature for positive force –

"Wind should continue at the door of mountain

Let's play the dhuduk, hengrong flute
Life should be tied with sound of fife
Hope should be increased today or tomorrow
Dark clouds should be removed tomorrow or some other day"

"Humorist friend Nagorchan"

Our poet Mrittika Chakma is a bright star glowing in his own light. These poems prove his poetic genius once again. His contribution to Chakma literature is invaluable and he will remind us about flora and fauna and rich heritage of Chakma culture. We hope that his literary journey will continue to enlighten us and for posterity.

Notes:

1. basket made of cane
2. jummo ritual of helping each other for jum cultivation
3. kind of cucumber
4. one kind of sour vegetable
5. orhor
6. similar with parrot and builds nest inside tree
7. one kind of bamboo
8. drawing room
9. (traditional physician who uses medicinal plant from forest)
10. an amulet
11. handmade cotton of an adolescent girl
12. an extended part of house made with bamboo
13. a small bridge made of bamboo
14. kind of ant
15. small birds who flock together

পরিচিতি : কুলদীপ রায়, বিশিষ্ট কবি, পুস্তক সমালোচক ও উন্নয়ন কর্মী, রাঙামাটি ।

জগৎ জ্যোতি চাকমা

বোজেগর বেল্লে মাধানত তুই

বেল্লে মাধানত ইজোরত বোই বোই দেঘঙর
বগাগুনর দুঅত গোরি বিদি যার বোজেগর রোদ
রানা-ডেলাবুঅত তুলি দের রাঙচ্যে অক্তয়ান।
অহ্রান কবাবুঅর পিদোৎ থুবো অর মিধে সুঞ্জুক।

দিন্ন ফুরেলে তুই এলে আধত জিংকানির পহ্র
কলগত ভঙের তুম্বাচ, তর পরানর-ভালেদর
তর ধবধবা আওঝর মুজুঙে মাধা নিগুরে আঘাচ্ছান
সারাল্যে আগাবুঅত আবুজে সনারং দুঅর চিল।

থির শলগত গিরগিরেই উধে তর ধল মুঅন
যিঙিরি পৈলে কবিতা মাডানার খেনত ঠুত্তো
তর ডোল আরুক দেঘি আহ্ঝে বোজেগর চানান
সারল্যে মরদর বুগোত ঝরে অসাগর ঝর'পুদো।

পরিচিতি : জগৎ জ্যোতি চাকমা, বিশিষ্ট কবি, রাঙামাটি।

পি কান্তি চাকমা

দেবাঝরত

আজার মাস্যি দেবা ঝরত গায়
গায়, সিনি সিস্যে চাগালাত
বানা এক্কান ঘরত, ঘুরুঙ গুরুঙ
দেবা পেরাগত কান' পুক মরন
কারবে বুঝেবার চেলে উজ
নেয়, শুনেবার চেলে উ জন নেই-
গায় গায় কি মুই কাদে পারিম
ইঙরি? আমক ওইনেই চিদে গরঙ
কি গুরিম।

মানেয়্যে চাগালাত এ্য-জিয়ে
দগর দিন, চেদনর রঙত শুমিজিয়ে
ফরমালিন আগ সান নেই আর
খেই ন' জিনি ভাগ দিদেক, ইক্কুনু
বানা নিজো বাইনি নিজে গরন
কন ইলবিল পাত্তানেই।

পরিচিতি : *পি কান্তি চাকমা, তরুন কবি, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি।*

কিশলয় চাকমা

মুরগুজি থানা মানে

মুরগুজি থানা মানে
জকপজ্যে উরিভো সান লেজউবো
দাভা দেনা নয়
ছদপদেই ছদপদেই পরানান বাজে বাত্তে নয়।
মুরগুজি থানা
লেজ থবা গুরি উদ থানা নয়
আহ্ধ থেং লেই দি দি পুষ মানি থানাও নয়।
মুরগুজি থানা মানে
লারেই গোরিবার লাই দম লনা, রঙরাঙ বল হিজানা
যিয়ান খুঝি সিয়ান স্ববনে দেগানা।
মুরগুজি থানা মানে
শলাঘরত শলাবিজি মাস জ্বলিবাত্যে আমিজে জুক্কোল থানা

থেঙ' হুজ আহ্দে আহ্দেই ছিন্দেভাস চুমি চুমি
লারেয়্যত ছেদাম তুলোনা।
মুরগুজি থানা মানে
ফু পাজ্যে মানজ্য সান মরনত্তুন জেদা ওই উদোনা,
নিজ'রে নিজে ছেই গোরি ছেয়ত্তুন ফিনিক পেগ
জনম লনা।

মুরগুজি থানা মানে
ঝুবো ছেরে পরোল বুরো অনা নয়
মৌপুক জ্বলে জ্বালাট ছেরেদ পূজো পাদানাও নয়।
মুরগুজি থানা মানে
ছেদাম পাঞ্জা নয় কার' ইধু স্যারেন্ডারও নয়।
কোচপানা দেরিগোরি পিত্থিমীয়ান গরানা জয়

পরিচিতি : কিশলয় চাকমা, বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার, খাগড়াছড়ি।

নমদীশ চাকমা

বসন্ত দিনত

বসন্ত দিনানত
জাগি উদের মনানত ॥
আদাম সমাজ নিতিয়ান ॥
পুরান মানুজর জিংকানিয়ান,
ঘরে ঘরে বেরা বেরী গোরিন্যেয়।
গল্প গুজব গোরিন্যেয়
হাসি রংমত্যে রোয় যেয়ন,
সুখে দুঃখে উজেয়ন।
আপদে বিপদে বল দেদি,
ভূল বুঝাবুঝি অহ্লে ছার দেদি,
সেয়ান্যে দোল সমাজ গোরিনে
জিংকানি কাদেয়ন বেক্কুনে।
বুরা বুরি কধা শুনিবং,
গম সমাজ গোরিন্যেয় থেবং
লেখা পরা শিঘিন্যেয়
জ্ঞানবুদ্ধি বারেন্যেয়
দোল সমাজ কাম গোরিবং।

পরিচিতি : নমদীশ চাকমা, বিশিষ্ট কবি, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি।

নির্মল কান্তি চাকমা

দ্বি পিরির কধা

কাপ্তেই গধা
ও কাপ্তেই গধা
জুম্মোগুনে কধন বানা
ত কধা,
তরে নিনেই বিলি
সরকাজজে হেল্লে ডুমুলুক খেলা
কলাবো দেগেনেয় বিলি
বাগলান দ্বি যেইয়ে
সে বাগলানদ বিলি
জুম্মোগুনে আজরত চুন্ডুল,
তারা ভূই জমিন ওই গেল ভন্ডুল।
অল বেক চিত পোরা
গুরি দিলে ঘর ছারা
পাদেলে পরেয়ে দেজত
ইত্তোহুধুম গুরি দিলে পর
হলাক ছারাছারি, আরাআরি।
ইরুক গধা কধা নেই আর
চুক্তি কধা কন
হর' হর', মিধে মিধে, তিধে তিধে
এদিক্কে গুরি গরদন আন্দোলন
এ আন্দোলনর থুম কুধু
বেক্কুনোর পিজোর?
জোব নেই হালিক
চলের বানা চলের-
চের ভেইয়ো রে চেরবু জু
তোমা সিজি চিদে মায়
সময় থাক্কে আ'ধ' জুল থাক্কে ঘা'ধ'
দাঘ কধা ফেলা ন' যায়।

পরিচিতি : নির্মল কান্তি চাকমা, বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষক বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি, রাঙামাটি।

শোভা রানী চাকমা

আওজর পরান্যে

মানেয় জিংহানি আন
সক্কেনেই দোল লাগে
যক্কেনে কোচপানালোই ভরি থায়
অথালেয়্যে খুঝি আর
থুম ন' ওয়ে স্ববন আনি
মনত গাদি রোয় যায়।

ওহ্ মর আওজর কোচপানা আন
মত্তুন তুই আজার মেল পথ
দূরোত আগস হি ওয়ে
রাধামন-ধনপুদি দোক্কেন
তর শিগেয়ে মিধে কোচপানালোয়
মর পরান ঘরান ত সিধু মিহ্ ঝি
যেয়্যে।

কধা দিয়োস মরে পরানান
সময় গোরি সাত-গাঙ সাঝুরি
ম সিধু এবে বিলিনেই তুই,
ফুল দেক্কেন রোঙ-চোঙ্যে
দোল স্ববন বুগোত বানি
বাচ্চেই আগং এঝ তত্তে, বাচ্চেই
থেম মুই।
(মিহ্ ঝে স্ববন)

__পরিচিতি__ : শোভা রাণী চাকমা, উদীয়মান কবি, তৃতীয় বর্ষ, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

তেজেন্দ্র চাকমা

ধর্মর মার

ধর্মর মার মানে ধর্মর শত্রু
গুনি ন-ফরিয়ে মানুজর শত্রু।
গৌতম বুদ্ধ সময়ত মারবু এল ভূতরুপে,
বর্তমান সময়ত দেগা দিল মানুজরূপে।
ধর্মর মারবু ইক্কুনু এমন দেগে পারে,
মানুজর পরানান ভাগত গোরি দিপারে।
তার দেগানায় মানুচ্চুন অলাক উভোয় ছারা,
দ্বি হিত্তেন্দি বিপদত পরিলাক এক্কেরে ভিধে ছারা।
সিত্তেই হনধে অজ্ঞানী মরে বার বার,
আর জ্ঞানীয়ে মরে বানা একবার।

পরিচিতি : বিশিষ্ট কবি তেজেন্দ্র চাকমা, রাঙামাটি।

পহ্‌র চাঙমা

চোগ'পানি ঝরঝরে ব'

ইধোত তুলিচ মন' হুলুঙুত্তুন
ইলেবিলে জাগুলুগে কুধু এলে
বান' পানিত গাঝ-বাঝ বাঝে'পা
হলুগ ঘুলত্তুন উদি আন্নঙ!

মুই দ' এলুঙ ম' ম' মিয়েভরা
তুই হি সেদিন হেনাবানি
মোরে পরান রিবেঙ লারিসারি
অলোজলো কোজোলিয়ে ত' ন'দোচ?

কোচপানা বিলে স্বর্গর আহ্‌ভা
যারেতারে অত্তপুরেও ন'অয়
মোরে খুব কোয়চ গেজ্জে, পহ্‌র
ন'লরিচ-ন'এরিচ বজান কোচপাঙ-

গভীনদ পরি যেদিন দুগ উদিবো
ঈদত তুলিবে তোর-মোর যিইয়ে
সুগ রেজ্জোত বুঙি বুঙি ঘুজ্জে দিনুন
দুগর কুরেকাজে কবালত লারচারানি-

কদগ বরমাগি দিয়োঙ সুগত্তে
তুই দ' দুক্কানিদ অনসুরে মে'ডাগিদে-
অত্তপুরে কোজোলিয়ে তোরে গেজ্জে
চিকিক্কো,তুই হিত্তে সিয়ান্নেন'বুঝর!

এযের দুক্কানি কেনে রাগেবে রাগা
বোনা বানিবানি ঘুরিফিরি চক্করে
মন' ভিদিরে-বারে কেনে থামেবে
সোক্কে ডাগিবে কিজেগ জোগারে,
পহ্‌র?

ত' চোগ' পানিয়ানি ন'শুগে ব'..
নিত্তবো টেত্তের টেত্তের ঝরঝরে ব'
কিত্তে, কিয়ান্যে পরানত্তুন নিগিলি
এযিবো-
দ্বি'আহ্‌ধে ধরি আগোলে পাত্তে নয়!

পরিচিতি : বিশিষ্ট কবি পহ্‌র চাকমা, রাঙ্গামাটি।

বিকেন চেগে

তিনকুরি বঝরর ফাগুনত

তর তিনকুরি বঝরর ফাগুনত এলে ফিরি;
উদোল ফুলুন গুজেই দিম ত'চুলান ধোরি,
ভেকফুলুন আনি ঝারত্তুন,গোজেম্ভি তরে
আঝি যেদুং চাঙ সক্কেও ত'কোচপানার ভরে!

তর তিনকুরি বঝরর ফাগুনত এলে ফিরি;
বেরেদুঙ চাঙ মেয়োনি, চেঙেত ত'আহ্ধ ধোরি,
পাউন্দি খেদত মন রাঙে রাঙে সাজে তুলিবের
ত' করতপরি বাঝি বেই বেই
সুখ্যে ধোজ্জেত দুবিবের।

তর তিনকুরি বঝরর ফাগুনত এলে ফিরি;
সেমেই ফুল পেদেবঙ দ্বিজনে,সমারে-সুমুরি,
ধুলনত ধুলিবং জাম বিজি গাঝত দরি বানী
দ্বিজনে আহ্ঝিবঙ মন গুমোরর কোচপানা আনি!

তর তিনকুরি বঝরর ফাগুনত এলে ফিরি;
বেরা যেবঙ আর' দ্বিজনে মুরোল্যের ছরা, জুরি,
রিনি চেবঙ চিগোন ছরার মাঝ, কাঙারার খারা
বর মাগিবঙ দ্বিজনে মিলি, সুঘি ওদোক তারা!

তর তিনকুরি বঝরর ফাগুন এলে ফিরি;
ধুধুক, সিঙে বাজেবঙ মনর কাজর ইরি,
জুমরান্যেত বেরা যেবঙ পেঘ' সমারে মাদিবঙ
ফাগুন' পুন্নিমাত ইজোরত বঝি গপ মাদিবঙ
তর তিনকুরি বঝরর ফাগুন এলে ফিরি।

পরিচিতি : বিকেন চেগে, বিশিষ্ট কবি ও সমাজকর্মী, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি

রুপসী চাকমা

ভাবনা সাগরত

ভাবনা সাগরত থুবেয়চ তুই
স্ববন দেঘেয়স মরে তুই
কোচপানা সাগরত ভাঝেয়স তুই
মনান ভাঙি দুওচ এচ্ছ্যে তুই
মরে তুই মরে তুই।

রাঘেলে বারি দুগত দুগত,
রাঘেলে জনম দুগত।
ভাবনা সাগরত থুবেয়স।

স্ববন....
কোচপানা ....
মনান ভাঙি...
রাঘেলে তুই মরে তুই
রাঘেলে ভারি দুগত
রাঘেলে জনম দুগত।

ওই পারে সিয়েন তর, কিজু দিনর কধা
ওই পারে সিয়েন তর
এক্কা এক্কা মরে কোচপানা।

সিয়েন এল মর, দুঘ দিন' সুঘর আঝা
গায় গায় জীংকানিত,
তরে নিনে আহ্ধি যানা।
ইক্কে সিয়েন অল তর,
মিজে কধা, মরে তুই মরে তুই
রাঘেলে জনম দুগত।
তুই এলে মর পরানর থুমান
ডাগিদুং পরানান
ম' পরানান।
এই জীংকানিত, কোচপেয়ং তরে ভঝমান।
ভারি গোরি আর' তরে কায় পেবার চাং।

__পরিচিতি :__ রুপসী চাকমা, উদীয়মান কবি, মারিশ্যা, রাঙামাটি।

শান্তি প্রিয় চাকমা

এয' মাহ্ ভাঝে কধা কৈ

মাহ্ মাদি মা ভাঝ বেগ জাদর পরান থুম,
ইয়েন আহ্ঝি লগি গেলে সে জাদ অভ' থুম।

এয' মা ভাঝে কধা কৈ
ন'হলে আমাত্তুন লুগি
আমনে ধরি ন' রাগেলে
জাদর মা ভাঝ ন' থেব'।

ন'কন যারা মা ভাঝে কধা
চিগুন জার বুও সান্যে,
পরালেগাহ্ মা ভাঝ
লুগিবের ন' চেলে জাদ'মান্যে।

কিয়োই মা ভাঝে কধা ন' কৈ
অন্য ভাঝে কধা কন
জ্জর মা ভাঝ লুগোদন
আমনর জাদ পাত্তা ন' দে'দন
কদগ লো ইয়েদ দোন দে'দন
 দেজ'জাদ মাহ্ ভাঝত্যেই
লার-চার নহ্ গোরিলে ডুবি থায়
বিজোগত তোগেই প্যেই।

পরিচিতি : শান্তি প্রিয় চাকমা, কবি, রাঙামাটি।

এ্যাপোলো চাকমা

ঔঝো জুম্ম ভেই- বোনুন

দেজ, জাদ নিজো জাগা-ভুইবাজেবাত্ত্যেই,
উয' বেক্কুন মা- বোন, বাপ ভেই।
আহ্ধে আহ্ধ ধরাধরি গোরিনেই,
লারেই বাজেই একজধায় বেক্কুন মিলিনেই।
কুলনেই সাগরত সাজুরি কুল নপেলং জুমবন্দার,
নিজো জাগা-ভুই বাজেবাত্ত্যেই উযেবংবেক্কুন।
আরেলং জাগা-ভুই, মা-বোন, বাপ-ভেইরে,
আ কদক অত্ত্যেচার গোরিলেক আমারে!
আরেবার আর নচেই, দোল হিলগাঙানরে।
থিদব্বর রাগেবং পিত্তিমীবুগত, হিল চাদিগাঙান,
লারেই বাজে টিগিবং, সেক্কে পেবং হিল মানের সুকক্কান।
লারেই ন' গোরিলে টিগিপাত্তং নই,
সেক্কে লুগিজিয়্যে পশু-পক্কি সান আমারে থারেবাগ!
নতেবং কনাসেরে্যে, লুগি লুগি দরে দরে,
একজধায় লামিই রাজপদত! সোক্কে তে পেবং আমি
হিলচাদিগাঙর জুম্মজাতি আহ্ধত।
মুজুংগে দিনুন ভাবিনেই আমি আহ্ধিবং বানা
একজধা ঔই সংগরি, সেক্কেনে নিবিলি কাদাবন
মেরে্যে নেযে পারিবং।
মরিই আর বাজিই মুজুংগে ইজু উযেবং।
অধিকার মাগানা নপাই, একজধায় সিনি আনিবং,
মহান নেতা লারমার স্ববনর পদ ধরিনেই,
হিল বুগত ফুল ফুদেবং।
লারমা আমারে শিঘে যিয়্যে লারেই গোরি বাজিবার,
রেঙ কিজেগ দি দি লারেই গোরি
পেবং হামাক্কায় হিলচাদিগাঙত জুমবন্দার অধিকার।
উয'..... ও.....ও....

পরিচিতি : এ্যাপোলো চাকমা, বিশিষ্ট কবি, রাঙামাটি।

শান্তি প্রিয় চাকমা

ফিরি এযোক আহ্‌রেয়ে দিনুন

বালোক দূর জীংকানির পথ
আহ্‌দি যাদে যাদে একদিন
কক্কে যে সত্তোর-আশি পারঅলং
পরি গেলং বুরো ডাবত
কক্কে খবর ন' পেলুং
সক্কে খুব দোল দিনুন এল'।
আ! কুধু গেল' সেদিন ইক্কে

যক্কে ফাগুনো আভা ফিরি এভ'
মিধে সুরে যক্কে ডাগিবোকোগিল্লো
ডাগিবো যক্কে বিঝু পেক্কো
ঘরত তেবার মনে ন' হয়
মনান অভ' উভ' উভ'
রাধামন-ধনপুদি সাঝি
পারিিুং নাকশাফুল্লো।

রেত অহ্‌লে জুনো পহ্‌রদ
গুদু খারা, পত্তি খারা খিলিদং মিলেমরদ
নাদেং খারা, ঘিলে খারা থুম
অহ্‌লে পুনংচানর বাঝি বেদং
তান্যেবির বেদং খেংগরং
সক্কে খুব দোল সুদিন এল'।
যক্কে ইজোরচাং ভরন অভ'
গাজ' সেরেদি যক্কে উধিদো জুনপহ্‌র
আজু ফাং গত্ত সক্কে গেঙখুলি
রাধামন-ধনপুদির পালা শুনেদ'পরপর।

সক্কে খুব দোল সুদিন এল'

ধুতি, পিনোন-খাদি পিন্নে
ফুল তুলিদোং পোত্তে বিন্নে
ভাতজরা ফুল ভাজেদং
ফুল ভাজেই পাপ কাধেদং গঙ্গা মা নাঙে।
আ! ইক্কে কুধু আহ্রেলং সেদিন
আহ্রেলং চাকমার বিজগ আহ্রেলং দেজ
মিলেগুন যাদন জাতকুল ছারি।
সক্কে খুব দোল সুদিন এল'
এল দোল মানুজো মনানি
ইক্কে কুধু আরেলং সেদিন
আরেলং ইত্তোকুধুম
ডুবি গেল পানিত তল
চাকমার পুরনো রাজবারি।

পরিচিতি : শান্তি প্রিয় চাকমা, ছিমুজ্যাছরা, রাঙ্গাপানি, রাঙামাটি

বিপম চাকমা

যে গাজে ন চিনে মর ইন্দাকাল

যে গাজে ন চিনে মর ইন্দাকাল
তারে কিত্যায় কোচপানা দিম?

ফুদেবার মনে কলে ফুধোক তে ফুল
যক্কে যে কাল মনত মারে তার ফাল।
মুই ন দাগিম তারে
যিদু মনে কয় যোক যা সমারে।
আহ্ভিলেচ সাদাঙা ঐ
ফিরি যোক দুয়রে দুয়রে।

অহ্রান আগে, বারিজে আগে, আগে জারকাল
যারে মনে কয় লুলঙ গালোক
যার গীদে মনে কয় মারোক ফাল।
মুই তারে কোচপানা দিদুঙ নয়
যে গাজে ন চিনে মর ইন্দাকাল।

বাংলা অনুবাদ

যে বৃক্ষ আমার বসন্ত চিনে না
তাকে কেন ভালবাসা দেবো?

যা ইচ্ছা ফোঁটাক সে ফুল
যখন মনে তার জাগে যে কাল
আমি তো ডাকবো না তোকে
যেখানে ইচ্ছা যাক যার সাথে
দুয়ারে দুয়ারে মাথা খুঁটে
ফিরে যাক নিঃসঙ্গ দীর্ঘশ্বাস।

গ্রীষ্ম আছে, বর্ষা আছে, আছে শীতকাল
যার গীতে ইচ্ছা বাজাক সে তাল
তাকে আমি তো দেবো না ভালবাসা
যে বৃক্ষ চিনে না আমার বসন্তকাল।

পরিচিতিঃ বিপম চাকমা সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) বান্দরবান সরকারি কলেজ।

ম্যাকলিন চাকমা

মর কিয়োই ন' দাঘন

মরে কিয়োই ন' দাঘন
তুই জুমত ফিরিচ
ধারাঝ রাগেচ আরা কাবিবের;
স্ববন দেগিচ মুরোল্যে
মানেয়র চাগালাত আবুঝি।
তুও মুই আহ্ধঙর
আগাত্যে কাদাবন
রিজেঙত, নিঝেচ ন' পেয়্যে
উরগুন্যে গা সারি উত্যে অক্তত।
মরে কিয়োই ন' কন
তান্যেবির পালা গীত শুনেবার
থেঙা বাঙা গেংগুলীত স্ববন বিজিরেবার।
দজ্যে পানি চোগ ভর
পারনবির দ্বি চোগোত
আমিজে আঝি যেবার।
কধেই সাঙ রাধামন,
কিত্তেই এধক দুদ্দুরানি?
যেক্যে তুই নিজ পাজ
পরানদোই সুর কাবোচ বুনিবে
যেক্যে তুই কল্পনার কবালত স্ববন বুনিবে
সেক্যে তুই বুঝিবে
ঝালাব্বর সাঝন্যের জুম
তুগুনোর কাল্লোঙবুক্যে
জুম্মবীর দ্বি চোগোর স্ববন।

মরে কিয়োই ন' দাঘন
ধাঙদাঙ্যে ফাগুনো আভাত
ধানশিঝের শির' পানি ফুদোত মিঝি

পিরল্যে পাঝ পরানত
কিদেবর আগমুলিম জুরিথুম
আর তাগলক্কোই কধা কবার।
মরে কিয়োই ন' দাঘন
চন্দবি, ধনপুদি বিজগত ফিরিবের
জিংকানির কিদেবর জুম
রঙদঙত মিজিবের
হালিক মুই "ঘুভঘুপ্যে আন্ধার'
নিবুলি পদ ফুরি ফিরি এ্যালুঙ
শ্রীজ্ঞানর "পাদারঙ কোচপানাত "
স্ববন বুনিম বিলি আহ্ওজে।

সেনত্তে যেদক্কন ন' দেগচ স্ববন
বদাচোগী জুমবির কেইয়্যে রঙ;
তুই বুঝিদে নই কারহুচ্যে জুমর মন' যদন।

পরিচিতি : ম্যাকলিন চাকমা, বিশিষ্ট, রাঙামাটি।

রনজিত চাকমা

চাঙমা জাদর চিন

নাগ চেবেদাক, কেইয়্যে রাঙা কালা
ইয়েনি আজল নয়,
উরন পিনোন দেগিনেই মানজ্যে
কবাক
ইবে জাত্ত্যে চাঙমা অয়।
মিলেউনর পিনোন খাদি
টেঙাছরা আজুলি,
মরত্তুনর জুম্ম শিলুম
জুম্মো খবং, গানজা কানি।
মরত্তুনর দৌল লাগে স্যে
পিনিলে ধোধোপ্যে ধুদি,
আর ন' অলে জুম্ম খবং
বেক্কুনে বানি যুদি।
পিনোন খাদিলোই ফুধি উধে
চাঙমা মিলের জাদ,
মরদত্তুনও দেগা পরিব'
কিত্তেই যেদং বাদ।
খবং অলেও রাঘা পোরিব
থদাত বেরেই লগে,
চাঙমা মরদ চাঙমা মিলে
চিনেবং বেগে এনে।
ম' কধানি ভাবি চেবা
আওজর বাব ভেই, মা বোনলক,
পরর সলং উরি পিনি
দেগেবং ছদক আর কদগ?
মিলে মরদে সমাওে দেগেই
আমা জাদর চিন,
গদা পিত্থমিত ছিদি যেব'
চাঙমাউনর এয়্যে নুও দিন।

পরিচিতি : *রনজিত চাকমা, বিশিষ্ট কবি ও ব্যাংকার, কক্সবাজার।*

কী অদ' যার

ত্রিজিনাদ চাঙমা

রিনি চেলুঙ আর দেগিলুঙ ইচ্ছ্যে আগাজত তারা নেই
ভাবিলুঙ আর বুঝিলুঙ ইক্ক্যে কনকিচ্ছু আর ঠিক নেই
দেগঙর আর শুনঙর মানুচ্ছুনে বানা ব'নিজেচ ফেলাদন
বাজি থেবার তিরোজ বেগে আহ্রাদন
মনান পুজোর লর, ইয়ানি কী অর ইয়ানি কী অর।
তে এনে কী অদ' যার
নাকি জীবনান বানা জেদা চবাশাল?
নাকি অঝার নীলচুমোগাদ?
রিনি চেলুঙ আর দেগিলুঙ ইক্ক্যে পিথিমীত তারুমবন আর নেই
সেনে নেই পেক-মালমুরো-অহ্রিঙ-চঙরা
ছরায় নালায় নেই পুক-জুক, মাজ-কাঙারা আর বেগেনা
ভাবিলুঙ আর বুঝিলুঙ ইচ্ছ্যে আমি আর আগ' সান নেই
কন' একদিন সুদিনুন ফিরি পেবার আহ্ঝা কি রাগেয়েই?
পুজোর ল' ইয়ানি কিত্তেই এনান্ন্যে কিত্তেই?
রিনি চেলুঙ আর দেগিলুঙ ইক্ক্যে পিথিমীত বানা দমাদমি
নেইয়্যেবোর বুগো উগুরে বুটজদা আর টেঙ'মুরি
চিগোন জাদরে বজ নেযেবার আমিজে উচ্ছোমি!
ভাবিলুঙ আর বুঝিলুঙ মানুচ্ছুন আর মানুজ নেই
এমানুক্তুন বেজ তলে পোচ্চেই!
শুনঙর আর দেগঙর মানুজোর রেনারেনি কেনাকেনি পিজুমো পিজুমি
মনান পুজোর লর বানা, কী অর ইয়ানি কী অর ইয়ানি
নাহি মুজুঙে চাঙছারা লুগেব' এ পিথিমীর?

পরিচিতি : ত্রিজিনাদ চাকমা, বিশিষ্ট, রাঙামাটি।

রাঙাবেল চাঙমা (পিইউসি)

জীদিবং

লোঙি ন'থেবং কারোসিধু
পাল-ভাঙা, সেত্তেরা গোরিনে,
মনর কধা ভাঙি কবং
তেম্মাং খহ্লাত মিলিনে।

জীদিবং, জীদিবং, জীদিবং
মোন-মুরো, কিজিং-ছরা পাহ্রিনে,
চিল-ছাদারা, কামা-ভাঙা
উজেই যেবং বেক্কানি পৈদে পৈদে বানেনে।
উযেই যেবং ভালোদ্দুর
জাদর কধা ভাবিনে,
আওজ গোরি বেগে মিলি
পিচ্ছে পরি ন'থেনেয়।
পিচ্ছে পরি ন'থেবং আর
জীদিবং বেগে মিলিনে,
বিজগ' কধা, কিদেব' কধা
ইধোত বেক্কানি তুলিনে।
ইধোত তুলি বিজগ' কধা
রাধামন-ধনপুদির কধানি,
বিজয়গিরী, সমরগিরীর
ভালেদ ওয়ে পৈদেনানি।
জীদিবং আমি বেগে
সংসমারে মিলিলে,
বিজগখানি ফিরি এভ'
তেম্মাঙে ব'দিলে।
ইধোত তুলি আগ'দিনর
দোল দোল কিদেবপানি,
জীদিবং রহ্ তুলিনে
তেম্মাং খহ্লাত মিলিলে।

পরিচিতি : রাঙাবেল চাঙমা (পিইউসি),

এস্টনী চাকমা

লাঙনী তরে ইধোত উধে

লাঙনী চিদি এক্কান লিগিলুঙ
ভালোক দিন বাদে
আহমিযে ইদোত গুরি পুরি চেছ,
কোনপানার জীংহানিআন
যুনি মেয়োনি মেঘোর
খুঝির জলগায় আজি যায়,
এজ্জানে দিনোত যুনি
দ্বি চোগোত খুঝি স্ববনদোই এজোজ তুই
আমিজে মনান
দগিনো বুয়েরত রঙ ফুঙে
এচ্ছে আগাজত ফোদাংতাঙ জুনপহ্র
পিবির পিবির বুয়ের হেলি যায় মনজুরিত
কোচপানার লামা গীদর সুরপ
গম পানার কবিদে শুনাশুনি গোরিদোঙ
রিনি চা আগাজত বাপ্পি পেগে
দোল গীদ গেই যাদন
সাঝন্যে মাধান বেল ডুবিলে
নিগুজ নিগুজ পথ আদি যেদঙ
শিমেফুলুন যক্কে রঙে রাঙা সাঁজি উদিবাগ
নাকশা ফুলুন যক্কে ফুদি যান
জুম ঘরানত বুজি
ধান বুয়ানি রিনি সে তেদঙ
ও লাঙনী দগিনো বুয়রত
যক্কে ত সোনা রঙর চুলানি উরি যদ
মনানত সুজ্জুগ সুগো স্ববন বুনিদুঙ,
হিরবে লাঙনী তরে ভারি ইদোত উদের।

পরিচিতি : এস্টনী চাকমা, উদীয়মান কবি, রাঙামাটি।

চয়নিকা খীসা

এয বেগে সমারে

এয বেগে আহধে আহ্ধ ধরি মুজুঙেন্নি যেই,
মারামারি, ইংসে, পিজুম নয়
ব্যেগ জিদি লবঙ কোচপেই।
বেলর ছদক জুনপহ্র' ধোক্যে।
পহ্র ফুদেই পিত্তিমি বুগত,
দুগর মানে জিংকানি ভরি উধোক সুগত।

মিজে ইংসে গোরি কাবর বজং নচেবঙ,
নিজর পরান দি অহ্লে মনর সুঘে লরি যেবঙ।
গাঝে যেন ছাবা দে বেগরে
মাদি মা য্যেন থেবার দে আমারে,
আমিও সুগে দুগে থেবঙ কায়
বেগে আমি বেগর সমারে।
পিত্তিমি তর নয়, মর নয়
বেঘে আমি দি দিনর গরবা,
যেদক দিন বাজি থেই
থেবং ওইনে বেগর ছাবা।
কন' জাগুলুক থুম নহ্য় মারামারি গোরিনে,
আরও বেজ দুগ অয় ইংসের আগুনত পরিনে।

এককধায় একজধা ওই এয' আমি বেঘে
দুগ এলে সমারে লরিবঙ থেবং আমি সুগে।
আর নুও গোরি ইংসে পিঝুম কন'জনে কাররে,
সুগে কাধেই দিবং পিত্তিমি ,এয বেঘে সমারে।

পরিচিতি : *চয়নিকা খীসা, উদীয়মান কবি, মহালছড়ি,খাগড়াছড়ি।*

প্রগতি খীসা

কী জোব দিম মুই তারে

ধলহরা মনর কজমা গাভুরি সমারে
পলওয়েল পার্কত গাজতলে বজিনে
কালাকালা মেঘর গোঙারে গোঙারে
চেই এলুঙ উভোতঝাবত গোরি গঙে এস্যা
বরগাঙর কাবকাব তুবোলর নালর
পানি ফুদোয়ুন
মুই বেয়াল নিসুলি মনর তিরোজে
তুবোলর পানিয়ান চাহদে চাহদে
আবাডাহ্গরি ধলহরা মনর কজমা
গাভুরিরে অজমানে চাঙগে
বেয়ালগরি কবাল বিনেবিনে হানিহানি
বেগুদো চোগপানি পরের তার
দিগালেদি
সুলুমর এগপ্যাচদিনে চোগপানিয়ানি
ফুজিদিলুং গাভুরিরে থে' কলুঙ কি
ওয়ে পরান্নোতর?
তে মরে জোব দিলো চিদমন নহ্ ভিযে
আর মহ্ মনত কোইনে মরে তে কল'
দাদাহ্ ও চানাহ্ বরগাঙর পানি
মুরোত ডুবি আঘে
আমাহ্ অংশবংশ কুদুম্মো সগলর
আদাম, শবাশাল আহ্ রাজঘরান
জুনিস্যারে ইয়েনি চেই চেই কদগ
মনদুগর গীদ রঝেয়ে
হেল্যা রেদোত আদেক্কেগরি সবনে
দেক্কোঙ পুরণ রাঙামাত্তেন
ফিরিউল্লো তে মরে আহ্ কল
কাপ্তেপানি গদায়ান ওইনে নাহ্

আমাহ্ জুম্মোয়ুন কাছাড় নেফা
মিজোরাম তিবেরেত যে পেয়োন
আহ্ আমি যিগুন ইধু আঘিই সিগুনও
অলঙ অভেলোর
তারেতারে তে কোচপাপি নেই
চোগপিস্যে মুপিস্যে অদংকরলহ্
মদবদল, বিড়ি সিগারেট মদহাজি
ছারা হিচ্ছু নহ্ চিনোন
মদহেনে গাবুজ্যায়ুন ওলোমস্তো অনে
অবেদরগরি
পদেঘাদে পরিথেলে
লারেই গরিয়া মানুচ্চুনু মদখেনে ছনভন
অলে
জাতবাঝেয়ে মানুচ্চুন দিগকাভুলো
অলে
আমারে নিনে যিগুন গরগিরিত্তি
গরিবাক সিগুনে যুনি
বাগেথেগে মাহজে চানে তিদিকথিক
রগানি অলে
আমাহ্ জাদর উভোয়ান কি অভ
তলবিচ গরিচেয়োজনি এগবার?

পরিচিতি : *প্রগতি খীসা, বিশিষ্ট কবি ও মানবিক সংগঠক, রাঙামাটি।*

নূতন ধন চাকমা

চুমো তোন

তোন'র মধ্যে সোদঅ তোন,
সিয়ান অল' চুমো তোন।

চিগোন ছরা ইজে, মাজ, হাঙারা
যদি চুমোদ রানিলে।
রানদে রানদে তুমবাজ নিঘিলে।
যানে লেত্তো পরে
আ যদবদে পেদ পুরে।

জুমোদ রান্নে চুমো তোনানি,
হি এদক সোদ হিজেনি।
জুমোদ যেয়ে মানুজ দেলে হঙগে
চুমো তোন রানি হেবার
তমা সমারে মরেও
এক্কা নিবানি।

জুমোদ রান্নে চুমো তোনানি
যদবদে সোদ,
শুনিলেও লেত্তো পরে।
হাদে হাদে পেত্তো ভরে,
তো মনান ন' ভরে।

জুমো হুজু দিক
আদা আ চিগোন ছরা ইজে দিনেয়
যক্কে গুদেবে।
তুম্বাজ নিঘিলেদে বেজ গরি,
সে বাচ্চান্দোয়ও যানে পেদ ভরে।

চিগোন ধান ভাত,
সে লগে তেব চুমো তোন।
ফারদ ধুরি ছিনি যায় চঙ হেয় পারে,
যদিও ন' থায় হন সোত্তে তোন ।

যেদক হায়, সেদক সোদ,
চুমো তোনানি।
ঘরদ রানিলে সেদক সোদ ন' অয়,
জুমোদ রানিলে
হি এদক সোদ অয় হিজেনি।

পরিচিতি :নূতন ধন চাকমা,শিক্ষক, বিশিষ্ট কবি ও সংবাদ কর্মী, লোগাঙ, খাগড়াছড়ি।

ফিলিস্তিনি কবিতা

দারীন তাতু

কবির জীবনী

ইসরায়েলের রেইনেহ শহরে ১৯৮২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ফিলিস্তিন জনগণের মুক্তি পক্ষে ২০১৫ সালে ফেসবুকে প্রকাশিত প্রতিরোধ করো জনতা" প্রতিরোধ করো কবিতাটি প্রকাশের অপরাধে ইসরায়েল সরকার তাকে ২০১৫ সালে গ্রেফতার করে জেলে দেয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ২০১৬ সালের জানুয়ারী থেকে প্রায় আড়াই বছর গৃহবন্ধি হন। ২০১৮ সাল থেকে সন্ত্রাস ও সহিংসতা ছড়ানোর অপরাধে তাকে আবার পাঁচ মাসের জেল দেওয়া হয়। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরও তিনি নানা ভাবে হয়রানি হওয়ার পরও তিনি বলেন ***"আমার যত কষ্টই হোক, আমি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিশেষ করে কবি, শিল্পী, লেখকদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাব"।***

জেলখানাত শিগোল পিন্যে

অনুবাদঃ মৃত্তিকা চাকমা

এক হেপ,
তারা মরে মহ্ গোরেলাক
হারুপিনেই দুওন ম' থেঙত
তারা ম' কেয়্যেত বান দুওন, বানিলেক ম' ইত্থেন
বানিলেক ম' বেক্কান
তে সেবেদেন কলাক;
তারে বিজিরো,
তা ভিধিরেত্তুন সন্ত্রাসীরে নিঘিলেবং আমি!
ফুয়েই দিলেক চোখ;
এ্যান কি সিত্রি বংশত্তুন সরান ন' পেল' ম' মগজও।
ম' চোখকুনত্তুন তারা পেলাক উচ্চোনি জোগার;
ইত্থেনত পেলাক বালা সুজনার বল।
তারপর আর কিজেক দিলেক; চ্যেজখবদ্দার!
জেবত তা আত্থ্যার লুঘেই থোইয়ে।

তারে বিজিরো।
ফুদনাগান নিঘিলেই আন'।
সেনে তারা আর' মরে বিজিরেলাক...
থুমেদি মরে প্যেজ বেরেই তারা কলাক;
কয় উক্ক অহ্রখ আ উক্ক কবিতা বাদে
তা জেবত কিচ্ছুই ন' পেলং আমি।

দেঝ ছারি কন' হেত্যেত ন' যেম মুই

তারা টিপ দিলেক মর ওইনে
মুই ওলুং পুরি ফেলেয়্যে এই মাজারা
য্যেন ঝারি ফেল্যে সিগিরেদর ছেই।

গায়ানে মরে ছিনে কুদ' গরে
উন্ধি চেলে আমন' দেঝত
পরভাস্যে মুই।

দশজনর দুগে মংসা যে কলম
মুই ফেলেই এচ্ছ্যেং সিয়েন
আর' চ'
ক্যান য্যেন সুওদ থিয়েই আঘে সিধু
নিজর ভাগ্যর পালা গোরিব' ভিলি
তারপরও জিংকানী, জিংকানী গোঙিব'!
মরে ঘিরি-থ'
বুম মারেই ফেল'
বুম ফুদেই উরি দুও
লুগেই মার'
মরে গরাত বানি থ'
তুও মুই ম' দেঝ ন' ছারিম
ম' ঘর দুওর উরেই দুও
ম' আত্তানি নাজ গোরি দুও

ম' গাজ বাজ পুরি দুও

তুও মুই উক্ক আথ্যারী ওই
ত' মুজুঙে থিয়েই।
ম' জনম জাগাত মরনর আহ্ল ফেলা
ম' উগুরে বুমর ঝর ছিদি দে
তুও মুই ম' দেঝ ন' ছারিম।

আর ইহুদি বানানা নয়
নয় কন' দুষ গঝানা
নয় কন' তালিকাত থানা
ফিবেক দেনাত্যেই জনম মর
এ পিত্তিমিত মুই ইহ্লর তালগাজ
পেদ পরায় মরি য্যেম
তুও মাধা ন' লোঙেম
কন' মদেই ম' জনম মাদি বেজি ন' দিম
মরে পানাত ন' দিজ
মা করান
বেঘর আহ্ঝি
বইয়ো পাদাত্তুন অর্থ কারি নেযা
মরে বেক্কানিত্তুন পানা ন' দিজ
অয় লবয় গর মরে
সুন্জুক আ ঘুম
মুই সিধুই থেম
ইধুই থেম
এ য়েন ম' দেঝ
মুই কন' হেত্যেত ন' যেম
বেল উদন্ধিত মুই থেম
বেল য্যেন
উম ত' বিলেয়- প্যেজ বেরে দিবের
ম' দেঝর ছাবা ছারি
কন' হেত্যেত ন' যেম মুই
অন্যায় গোরি যুদি মারেই ফেলা অয়
ম যেরে

জনম লভ' আর' এক চিজিক ছ' লরান্যে
য্যে ফিরেই দিব' ম' জীংকানি।
মুই লারেই গোরি য্যেম
না অযুত নয়
মুই দেঝ ন' ছারিম, ন' ছারিম, ন' ছারিম

চত্ত্যে সিয়েন পুরি ফেলেই যাং

চত্ত্যে
সিয়েন পুরি ফেলেই যাং
আমা কিত্যে যা জিয়েনী ইক্কু গেল্ল্যের
আমা স্ববন জিয়েনী আমার ইহ্ধ ভরেই দিব'
সেই স্ববন গেল্ল্যেরান যুদি সত্য অধ'!
হালিক তারা যে মরাত পলাক আমা আহ্ধত।
ব্যেগ পুরি ফেলেম মুই, তে মর জীংকানির কোচপানা।
যেদক্কানি কোয়েই আমি
আমা ইহ্ধত বেরাত লেখ্যেই য্যে কবিতা,
রাঙায় রাঙায় আগেয়ং য্যে ছারা
খানেক্কন বস্যং যে গাচ্ছ্যের ছাবাত তলে
আঙুদি আঙুদি লিখ্যং য্যে নাং
ব্যেগ পুরি ফেলেম মুই।

চত্ত্যে
সিয়েন পুরি ফেলেই যেম
রাগ ন' জলিস সালে।

বিঃ দ্রঃ কবিতা গুন এন্ডু লেবর, ঘাদা মুরাদ, জোনাথন রাইটসআ তারিখ আল হায়দারত্তুন আরবি ভাষাত্তুন ইংরেজী অনুবাদ। সে পরে ইংরেজী বাংলা আর বাংলাত্তুন চাঙমা অনুবাদ গরা অল'।

পরিচিতি : *শিক্ষক, মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়, রাঙামাটি।*

হেমা চাকমা চন্দনা
কোচপানার জ্বালা

আগে যুদি অধ' দেগা ও পরান্যে,ও পরানান
দেগা ন' অহ্ল' তরলোয়
বেক্কান অহ্ল' কবালর যদন
কুধু এ্যাহ্লে কনা ও পরান দা, ও পরানান (২) বার।

তরে দেগা পেইনেয় ম' এ মনান, ও পরানান,
আহ্ঝি যেধ' চাই হিল চাদিগাঙ
মোন মুরো ছরা গাঙ ও পরানান।
ম' এ মনান পেধ' চাই বারে বার
তর কোচপানাগান
কুধু এ্যাহ্লে কনা ও পরান দা, ও পরানান। (২) বার। ঐ

সারা জনমত্যেয় ম' এ মনান ও পরানান,
বানা তরে নিনেই কোচপানা সাগরত ডুবি যাঙ,
কি গোরিলে মরে কনা, ও পরানান
কোচপানা জ্বালায় বুক্কো আঙি যার,
ম' এ মনান পেধ' চাই বারে বার
তর কোচপানাগান,
কুধু এ্যাহ্লে কনা ও পরান দা, ও পরানান। (ঐ)

কোচপানা মালা পেনেই
ম এ মনান আল্যেংঙত বাজেল্লি,ও পরানান
তুই অলে মর ইক্কু সুখ দুগো সমারান,
ম এ মনান পেধ' চাই বারে বার
তর কোচপানাগান,
কুধু এ্যাহ্লে কনা ও পরান দা, ও পরানান (২) বার। ঐ

এ মনান ভাবত তরে যদক্ষন
কোচপানা মিয়্যে জাগি উদে
আহ্ঝি যাঙ বানা তরে লোই
হিল চাদিগাঙত,
ম এ মনান পেধ' চাই বারে
বার তর কোচপানাগান
কুধু এ্যাহলে কনা ও পরান দা,
ও পরানান।
রেদোর আগাজত অঙ যুদি
তারাগুলোর সান,
ভাঝি ভাঝি তেম পরান, হিল চাদিগাঙর আগাজত আগাচ্ছানত,
এ মনান কধা কবার চায় তরে
লোই গরে বানা দারোজ
কোচপানার আল্যেঙ্যে
মনর কধা কোয়
কাদেই দিবোঙ পুরো রেত্তোন।
ম এ মনান পেধ' চাই বারে
বার দর কোচপানাগান
কধু এ্যাহলে কনা ও পরান দা, ও পরানান। (ঐ)
ঝুরো ঝুরো গোরি কধা কোয়
বানা তরলোয় দ্বিজনে,
ভিঝি যেবঙ রেদোর
হুয়োলোই শিরোপানিত
জুনি পুগোর সমারে, ও
পরানান।
ম এ মনান পেধ' চাই বারে
বার তর কোচপানাগান,
কুধু এ্যাহলে কনা ও পরান দা, ও পরানান।
ম মনান পেধ' চাই বারে বার
তর কোচপানাগান।

পরিচিতি : চন্দনা চাকমা হেমা, বিশিষ্ট কবি, গীতিকার, দীঘিনালা খাগড়াছড়ি।

জড়িতা চাকমা

হিল চাদিগাঙঃ আমার জন্মভূমি

এই আমাদের জন্মভূমি, হিল চাদিগাঙ তার নাম,
মোদের গৌরব, মোদের আশা, মায়ের স্নেহদান।
জুম্ম জাতি, আদিবাসী, কথা বলি দশ ভাষায়,
তোমার মতো মাকে, কোথায় খুঁজে পাই।

তোমার আলো, তোমার বাতাস, দেহে আছে মিশে,
আছে আরো সবুজ পাহাড় নীল আকাশের নীচে।
এই পাহাড় আদিবাসীর, জুম্ম জাতি জনতার,
অনেক স্বপ্ন দেখে তারা, এই পাহাড়কে বাঁচাবার।

সবুজ ঘেরা এই পাহাড়ে, হবে শান্তির জয়,
শান্তি হবে সদাজয়ী, মানবে নাকো পরাজয়।
প্রভাতকালে পূব আকাশে, যখন তাকাই তোর দিকে,
শ্যামল শোভা, উদার হৃদয়, মাগো দেখি চারদিকে।

আদিবাসী জুম্ম মোরা, দশ ভিন্ন ভাষাভাষী,
বিনি সূতোয় গাঁথা মালা, যেন পাশাপাশি।
জুম্ম মোরা বাংলাদেশী, এই পাহাড়েতে বাস,
সুখে-দুখে থাকা হেথায়, করে জুম চাষ।

পাহাড় দেশের জুম্ম মোরা, ভূমি মোদের প্রাণ,
বাঁচা-মরা, লড়তে হবে, রক্ষিতে নিজের মান।
মাগো, সোনালী দিনের স্বপ্ন দেখি, শুঁয়ে তোমার বুকে,
থাকবো মোরা জনমভরে, তোমার কোলে মাথা রেখে।

দেশ থেকেও দেশহীন, ভূমি থেকেও হয়ে ভূমি হীন,

দেশ ছেড়ে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে-পশ্চিমে বয়ে যায় দিন।
দেশ ভাগ, আর কাপ্তাই বাঁধ, মোদের করেছে ভিন্ন দেশী,
বঙ্কুল, গোমেতকূল আর দেশকূল সবখানে মোরা আছি।

রাষ্ট্র সীমানা, কাঁটার বেড়া, পারেনি বিচ্ছেদ ঘটাতে
রাধামন-ধনপুদি, ছালবাপ-ছান্দবী রয়েছে, সব জুম্ম ঘরে ঘরে।
ভিন দেশী, এক ভাষায় বলি কথা, থাকি এপাড়-ওপাড়ে,
হিল চাদিগাঙ মোদেরী, বাঁচার স্বপ্ন দেখি আজো, এক সাথে

পরিচিতি : জড়িতা চাকমা, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি।

নূপুরী চাকমা
পাহাড়ী

জাগো পাহাড়ী জাগো
দুরন্ত অসীম সাহস নিয়ে সামনে এগিয়ে চলো
বাংলাদেশের অবহেলিত পাহাড়ী আমরা
জীবন দিয়ে রাখবো আমাদের
ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি
যে সব বাধা আসুক না কেন
সব করবো জয়
নবীন পথিক পাহাড়ী আমরা মানবোনা
কেনো ভয়,
শান্তির জন্য লড়বো
সম্প্রীতি গড়বো

দূর করবো সব জঞ্জাল
জাগো পাহাড়ী জাগো।

পরিচিতি : নূপুরী চাকমা, বিশিষ্ট কবি, রাঙামাটি।

বিজয় গিরি চাকমা

দুই দিনের সংসার না করিও অহংকার

দুই দিনের সংসার
না করিও অহংকার,
সুখে থাকলে কেন তুমি
কর এত বার।

শিশুকালে না বুজিয়ে
যেমন তেমন বলি,
বড় হলে জেনে বুঝে
কেন অহংকার করি।

চালাকি হলে মানুষেরে
কত কষ্ট দেয়,
পন্ডিতের ভাষায় বলে
মূর্খ মানব সেই।

মৃত্যুর কথা ভাবো তুমি
না করে অবহেলা,
জ্ঞান দিয়ে ভাবনা কর
তুমি সারা বেলা।

যুবক কালে সুস্থ থেকে
কত কর পাপ,
মৃত্যু কালে সেই পাপ
কর্মফলে না করিবে মাফ।

যৌবন কালে মুত্যুর ভয়
না করে কখন,
বৃদ্ধ কালে বুঝে সে
রোগের যন্ত্রনা কেমন।

হে নর নারী তুমি
ভাবো বার বার,
অহংকার না করিয়ে,
হও জ্ঞানের ভান্ডার।

পরিচিতি :বিজয় গিরি চাকমা, বিশিষ্ট কবি ও সমাজকর্মী, রাঙামাটি।

কোহিনুর আক্তার

কো

কতোটা পথ হেঁটেছি আমি
কতোটা কষ্ট আমি বুনেছি
আমার নিয়তির খেম খামারে।
কেউ নেই তো ছন্নছাড়া জীবনে
ভালোলাগা স্বপ্নগুলো হুইলচেয়ারে
বস পঙ্গুত্ব আকাঙ্কার উদ্ভাসিত
আলোয় হৃদয়ের খুব ছোট
পাওয়া ইট পাথরে গাথা
প্রেমের ঘরটি ভেঙ্গে ছিটিয়ে
দিয়েছিলে জল শূন্য মরু উদ্যানে।

কতোটা পথ হেঁটেছি আমি
নিরস মনের ক্ষণে
ক্ষত বিক্ষত হয়েছে চরনও তলে।
বহু-দূর ঘুরে আমাতে আমি ভাসি ছদ্মমনে
উদগী ব্যথা গহীনে জ্বলে
ধিকধিক অনলে।
আর কত পথ আছে জীবনে
তোমারই পথে?

পরিচিতি : *কোহিনুর আক্তার, বিশিষ্ট কবি, রংপুর।*

সুলতান আহমেদ সোনা

শুভ হালখাতা

বৈশাখ পড়লেই ব্যস্ত গদি
পুরাতন খাতা হয় ঘাটাঘাটি
কর রয়েছে কত যে বাকী,
কারো নাম বাদ পড়লো নাকি!

পয়লা বৈশাখ মানেই শুভ হালখাতা
নতুন বছর খোলা হয় নতুন খাতা

ফের শুরু হয় জীবনের যাত্রা
চেতনায় করে ভর নতুন মাত্র
কলের গানে সুর আনে
ছন্দ বিলায় প্রাণে প্রাণে।

বটতলায়
বিয়ান বেলায়
শত শত মানুষ জোটে
পিঁয়াজ পোড়া লংকায়
তৃপ্তি খোঁজে ভাতুন পান্তায়
তাতেই স্বপ্নের ফুল ফোটে।

বৈশাখী মেলায়
সারাটা বেলায়
সাঁচ বাতাসা খাকড়াই
মুড়ি জিলাপি বুন্দিয়ার রসে
ফেলে আসা দিনগুলো হাত্‌রাই।

হয় বিকাল বেলা লাঠি খেলা
বাংলা ঢোলের তালে
সবাই সাঁঝ পেরুলেই আটকা পড়ে
পুঁথি পাঠের জালে -

কিসস্যার গানে আনন্দে বানে
সারা বাংলা ভাসে
সবার কামনা বৈশাখ যেন
বার বার ফিরে আসে।

পরিচিতি : সুলতান আহমেদ সোনা, বিশিষ্ট কবি ও সম্পাদক, বজ্রকথা রংপুর।

কুলদীপ রায়ের দু'টি কবিতা

আগমন

শ্বাপদসংকুল জনপদ, সর্ন্তপণ পদক্ষেপ।
আলোর রশ্মির ছদ্মবেশ,
অমাবস্যার অযাচিত দৃপ্ত অঞ্চল;
সবান্ধবে প্রতিনিয়ত অবগাহন।

অতিকায় আকারের প্রাণীর অদ্ভূত আবাস,
স্বইচ্ছের পুনরাবৃত্তি, বর্ণচোরার সদম্ভ পদচারণা।
হঠাৎ উদয় হয় বৃষ্টির ফোঁটা, ব্যাঙের ছাতার
আর্বিভাব সময়ের প্রয়োজন।

পুঞ্জীভূত মেঘের অবিরাম সংঘর্ষ,
বুদ্ধির ধারালো ব্যবহার।
ঘোর অমানিশায় আলোর বিন্দু রেখার
অদম্য,দুর্মনীয়, দুর্বিনীত আগমন।

বোকা মন

কুলদীপ রায়

উত্তাল তরঙ্গে হাবুডুবুতে ব্যস্ত,
প্রাণান্ত লড়াই। ভূতপূর্ব দৃশ্যের
চকিৎ পুর্নমঞ্চায়ন; রক্তিম চোখে
কিসের আশায়? আসন্ন ভবিতব্যের
অমোঘ হাতছানি।

কাগজের কারসাজির কুৎসিত খেল,
তথাপি একমাত্র অবলম্বন। স্বীয়

সত্তার অস্তিত্বের লড়াইয়ের সাথে
প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা সম্মিলন। কিন্তু
ফলাফল? তা-ও নির্ভর সময়ের জেল।

নিষ্পাপ পৃথিবী সে তো কবির কল্পনা,
বইয়ের মলিন পাতায় বিবর্ণ আদর্শগুলো
ঝুরঝুরে। কারোর কি কোনো
ভ্রুক্ষেপ? সবেগে চলমান তথ্যপ্রযুক্তির
কানাগলির উন্মাদ উল্লম্ফন।
যাক্‌গে চর্বিতচর্বণের পুর্নকথন।

হৃদয়ের সঙ বোঝে শুধু লাভ-ক্ষতি।
আবেগ যেন বুদ্‌বুদের মত ক্ষণস্থায়ী।
চিলেকোঠার মগজে মূল্যবোধের যাবজ্জীবন,
আঘাতে আঘাতে জর্জরিত কিছু বোকা মন।
প্রতিকার? জানা নেই আমার, হয়তো বা
আপনারও.....

পরিচিতি : কুলদীপ রায়, বিশিষ্ট কবি, পুস্তক সমালোচক ও উন্নয়ন কর্মী, রাঙামাটি ।

বীর চাকমা

দুঃস্বপ্নের কাব্যগাঁথা

বহমান জীবনের পথে
মরুক্লান্ত পথিকের মত
কেবলি হেটে চলেছি
তপ্ত বালুকারাশি মাড়িয়ে।

হামেশা দগ্ন হতে চলেছে
অনুভূতির কোমল পরশ।
কঙ্কালসার ভালবাসায়
জানে না কোন আবেগ,
ধুলোমাখা স্মৃতির ক্যানভাস,
এ কোন নষ্টালজিকতা?

স্বপ্নহুলোতেও পঁচন ধরেছে নিঃসন্দেহে,
অশ্বীরীর আত্মভর করেছে ইন্দ্রিয়গুলোয়
এ যেন এক অভিশপ্ত জীবনাচরন।
ক্ষুধার রাজ্যে নাকি পৃথিবী গদ্যময়,
দুঃসহ বেদনাবোধের উপমা তবে কি?

পরিচিতি : বীর চাকমা, বিশিষ্ট কবি, গীতিকার, সুরকার ও সংগীত শিল্পী, রাঙামাটি।

রুপেন্দু বিকাশ চাকমা

কি পেতে কি পেলাম?

মোদের বাড়ীর আঙ্গিঁনায় ছিল
দাদুর রোপিত আমাগাছটা।
দাদু বলেছিলেন-তোদের শরীরে চাহিদা
মিটাবে মোর রোপিত গাছটা।
ফলন্ত সময়ে কোন এক প্রাক্কালে,
আগ্রাসনের শক্তির কবলে পড়ে;
বিলুপ্ত হলো মোদের গাছের প্রাপ্যটা।
গাছ হারালো বেদনা নিয়ে
পরিবারে স্পষ্ট ভুলবুঝাবুঝি সৃষ্টি হলো।
প্রাপ্যতা হারানোর বাস্তবতা উপলব্ধি না করে
একে অপরের দোষ চাপাতে 'টক শো' শুরু হলো
নির্দোষ প্রমানের জন্য রেসলিংয়ের মঞ্চ সৃষ্টি হলো।
নির্বোধ বালকের মত-মূল্যবোধের শক্তি
সকলের অকপটে হেরে গেলো।
জন্মগত প্রাপ্য অদৃশ্য স্নেহের বন্ধন
মুহুর্তের মধ্যে হিংসাত্বক রুপ ধারন করলো।
দাদুর স্বপ্নখানি-মারপ্যাচে পড়ে
কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।
তাই বিবেকের কাছে, প্রশ্ন জেগে উঠে
কি পেতে কি - পেলাম?

পরিচিতি : রুপেন্দু বিকাশ চাকমা, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল কর্মকর্তা, সুবলং উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র।

সুমিত্র চাকমা

হে প্রিয়া, তোমার প্রতীক্ষায়

হে প্রিয়া, তুমি আসবে বলে
অনাদিকাল ধরে বসে আছি পথ চেয়ে
তোমার জন্য বুনোফুল পাখিগুলো
করেছে কত সব আয়োজন।
জুম ক্ষেতের পাতায় সোড়ানো জুমতুলো
আড়াআড়ি ধানের শীষ
ঐ যে তোমার বন্ধু গাহিছে গীত
জুম দেজত গাজে গাজে ফুল ফুদিবাক
চেরোহিত্যে পেগে গীত গেবাক
কণ্ঠে আর ছন্দে কী যে কাঁপন
যেন মিছিলের মতো স্লোগান আর স্লোগান
তবুও কানে বাজে অপূর্ব সুর লহরী
আসি প্রেমময় প্রনয়িনীর মতো
তাই বড্ড বেশি আকুল তোমার জন্য।
তোমার জন্য সমুদ্রের ফেলিল ঢেউগুলো
আজও ভেঙ্গে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে
তোমার জন্য হথন ধ্যানস্থ হয়ে
লিখে লিখে "ওয়েটিং ফর গড"
ঐ দেখ বৃদ্ধ অশীতি পর
চেয়ে আছে নির্বাক ছাউনি ছুড়ে
ফুলের মতো তুলতুলে শিশুটি
স্বর্গের দিকে চোখ ছুড়ে আছে
অধীর প্রতীক্ষায়'
শুধু তোমার জন্য
তুমি আমার বলে পথপানে চেয়ে চেয়ে
শিশু থুবা বৃদ্ধ কাতারে কাতারে
অপেক্ষায় প্রহর গুনে
শুধু তোমার জন্য।

পরিচিতি : সুমিত্র চাকমা, বিশিষ্ট কবি, রাঙামাটি ।

প্রয়াত চিত্র মোহন চাকমার অপ্রকাশিত একটি কবিতা

স্বার্থক ধ্যান

নমো নমো বনভান্তে মানব শ্রেষ্ঠ তুমি হে মহান,
বিপথ গামী অন্ধজনে তুমি করেছিলে আলো দান।
চটলার নন্দন কাননে প্রথম বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে,
প্রব্রজিত হয়েছিলে দুঃখ মুক্তির প্রত্যাশা নিয়ে।
দিন যায় ক্ষন যায় কিন্তু হায় কোথায় সেই মুক্তির পথ?
জিজ্ঞাসিতে গিয়েছিলে তাই প্রব্রজিত গুরুর নিকট।
মুক্ত বিহীন নিজে সে উত্ত রিল দীপংকর মহাথেরো,
উপদেশ দিল শুধু ঘরে ফিরে গিয়ে ধ্যান সাধনাকরো
গুরুর আদেশ পেয়ে নিজ গ্রামে ধনপাতায় ফিরে এসে,
গ্রামে থেকে দুরে গহীন বনের এক পর্বতের পাদদেশে
সবুজ পল্লবে বিছান সজ্জিত করে কঠোর সাধনায়
মগ্নছিলে ছিন্নবস্ত্র পরিধানে অনাহারে অনিদ্রায়
কেটে যায় কত বর্ষ শেষে পেয়েছিলে শ্রেষ্ঠ সম্যক জ্ঞান,
পুন করেছ মনের বাসনা, স্বার্থক হয়েছিল ধ্যান।

পরিচিতি : *চিত্র মোহন চাকমা, বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার, জুরাছড়ি, রাঙামাটি।*

সুবেশ চাকমা

বিশাখা

হেমন্তের আগমনে ঝিল্লি মুখর শেফালীবনে
শিশির সিক্ত ভোরের যাওয়ায় পাখীর কলতানে।
পুন্যময় চীবর দান কার্ত্তিকের পূণিমা তিথি,
জাগিল সবার মনে দানিবে নিরবধি।
কিন্তু হায় প্রথম করিল সে কঠিন চীবর দান
সে তো আমাদের সাঝে নেই-বিশাখা তারই নাম।
বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘ কায়মনে নিয়ত করিত সেবা।
নারী শ্রেষ্ঠ উপাসিকা তারি সম নহে কেবা।
অকাতরে করে দান মতত মধুর বচন
সর্বগুনে বিভুষিতা কতই উজ্জ্বল জীবন।
আজীবন উদার হৃদয়তার তুলনা বিহীন
মরিয়া হয়ে ও যুগে যুগে অমর থাকিবে চিরদিন।

পরিচিতি : সুবেশ চাকমা, বিশিষ্ট কবি, রাঙামাটি ।

কিকো দেওয়ান

আত্ম পরিচয়

নাক চ্যাপ্টা পাতলা ঠোঁট ফর্সা
মায়াবী চোখ... কে তুমি সুধায়
মোরে। বলি আমি
চাকমা, মারমা, গারো
ত্রিপুরা, আর বলি
তনচগা, বম, খেয়াং। আর ও মোরে
প্রশ্ন করে, কোথা থেকে তুমি
এলে? প্রতি উত্তরে বলি জুম্ম
জাতির থেকে। শুনেছ কি সেই
নাম মানবেন্দ্র নারায়নের
কথা, চুপ করে রই আবার প্রশ্ন
করে কোথায় তোর ঠিকানা? বলি
আমি শুন তুমি মতন
দিয়ে, পার্বত্য অঞ্চল আমার
গাঁ, সেথায় মোর আবাস স্থল
জুম্ম জাতির জুম্ম মানব আমি।

মোনঘরের পথে ফোঁটা একটি
ফুল জনম দুখী মানুষের অশ্রু
ভেজা ঠিকানা আমার, রাজপথে
রক্তের লাল বিন্দু আমার
ভায়ের, চিৎকার করা অভাগিনী
ললনার বোন। শুনেছ কি
কখনোও কল্পনা চাকমার কথা?
তারই প্রতিচ্ছবি আমি। আরও
বলি.. কে আমি ১৯৮৬ সালের
হাজারও ভাই বোনের ঝরে পড়া
রক্তের বিন্দু, অশ্রুভেজা কান্নার
চোখের জল দুঃখি জুম্মদের
কণ্ঠের আবেগেরসুর। বিদ্রোহী
জুম্ম কবিদের বাণী, কাপ্তাই
বাধেঁর তলদেশ থেকে উঠে আসা
হাজার ও কণ্ঠের বাণী, কণ্ঠ ছাড়া
মেলেনি আজও মৃদু হাসি কোন
মা বোন হাসতে পারেনি মন
উজার করে।

পরিচিতি : কিকো দেওয়ান, উদীয়মান কবি, রাঙামাটি।

রুইয়াং ম্রো

মন পাহাড়

পাহাড় ডাকে আমায়
শেকড়ের টানে,মন ছুয়ে যায়
মন পাহাড়ে, ঐ মোদের গ্রামে।
সবুজ পাহাড়ে
বর্ষায় বৃষ্টি পরে আকাশে সাদা নীলিমা
ভেজা অরণ্য জঙ্গলে কোকিলের কণ্ঠে
মন ভরে যায় আমার মন পাহাড়ে।
পড়ন্ত বিকালে রংধনু রং রাঙিয়ে দেই
মন পাহাড়ে।
জোৎস্না রাতে জোনাকি আলোতে
আমি ঘুরে বেড়াই আমার মন পাহাড়ে।
শীতল হাওয়ায় পাহাড়ে ভোর আসবে।
বসন্ত ফুল ফুটবে,পাহাড়ে ঠাই হবে না জলপাই রঙে শকুন।
পাহাড় ও পাহাড়ের ভূমি পুত্রদের বাচাতে
গেরিলা আসবে মন পাহাড়ে।
সবুজ পাহাড়ের লাল রক্ত, ধর্ষকের হিংস্র থাবা,
ভূমিদস্যু, দালাল, শাসকের অপশাসন, বিপন্ন জনপদ
বেয়ে যাবে সাঙ্গু, মাতামুহুরি,কাপ্তাই নদীর স্রোত থেকে সমুদ্রজলে।
নব ঋতু হবে,নতুন ভোরের আলো উঠবে।
হবে নব নিশান, হবে অরণ্য সবুজ পাহাড়
আমার মন পাহাড়ে।

পরিচিতি : রুইয়াং ম্রো, বিশিষ্ট কবি, বান্দরবান।

এস্টনী চাকমা

দীর্ঘ রজনী

কত দিন
কত দীর্ঘ রজনী যেন কোন এক শতাব্দী
হাসিতে নেই প্রাণ তম
হৃদয় বিধারিত মম হে নিবার্কে
যেখানে নইে কোন নিমগ্ন উল্লাস,
নেই পরাজয়ের ভয়,
সেই বিধারিত বিচালতার মাঝ পথে
আলোকিত এই আমি আলোড়নে
যেতে চাই নিরবে,
সিগ্ন মায়া এসো না তুমি,
এই মনের চোরাকাটাই তোমার নেই কো স্থান
আমি আজ পথ বিলাসী
বিচালতার মাঝে
পথ ভোলা কল্পরেখায় পা ফেলছি
শূন্যতার তীব্র অনুভূতির
পরাজয়ের শিকলে বাঁধা
যেখানে ক্ষণে ক্ষণে ভয়,
নেই কোন আত্মসংগতির অধিকার
বদ্ধ কণ্ঠ হয়
বদ্ধ বুকের ভেতরটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে বিধারিত
কেও শুনবে না পাহাড়ের আত্মনাৎ
কেও জানবে না।
কেও জানবে না
নিরবতার বিলীন হওয়া
পাহাড়ী মায়ের কষ্ট
চোখের এক কোণে হাজার হাজার কষ্টের চিদ্র
আশা বরষার বুক ভরা আশ্বাস নিয়ে
তবুও আশা রয়েই যায়
গভীর অনুশচনা
তবুও বেঁচে আছি বাঁচার তাগিদে
দীর্ঘ প্রতিক্ষা আজো দীর্ঘ রজনীতেই বেলা হয়ে গেল।

পরিচিতি : এস্টনী চাকমা, উদীয়মান কবি, রাঙামাটি।

চিজি খীসা
গায়সুয়েই গোরি

মোনতলা আদামত গোরি নাঙে ইক্কু চিগন গুরু। তারা আট্য ভেইবোন। আদামত বেগত্তুন নাদা তারা। তা বাপপো নিত্য মদ খেদ'। তা মারে পিদিনেই ঘরত্তুন দাবেই দিদু। কাররে লেগাপরা শিগিবাত্তে ন' দে তা বাপে। কিন্তু তার লেখা শিগিবার বারি আওজ। তা আওজে গুরি ঘরত্তুন ক্লাস ফাইব পাজ গরে। তা বাপে তারে কয় গুরি মর পোঅ নয়। তে মনত দুগে ঘরত্তুন লামি যায় দজ বজরে। সিত্তুন ধুরি তা জিঙকানি যুদ্ধ ফগদাং অয়। গাজবাজ হাবা, লামানা নগরে পারা কন' কাম নেই লেগা শিগিবাত্তে। ইক্কু ভান্তে তারে চিতপুরি কিয়ঙত তারে সেবক রাগেই লেগা শেগায়। কিঙয়ত কাম গোরি তে মিট্রিক পাজ গরে। তারে দারু ভাগ গোরি দেনা এক্কান কাম দুওন। তে সিত্তুন যেদক টেঙা পেদ' সে টেঙালোই কলেজত ভর্তি অয়। সে টেঙালোই তার নয় সেনে আরও মানজর কাম গোরি দিদ' তে। তে তা শিগোন ভেইরে স্কুলত লেগাপরায়। কামে কামে তা লেগা শিগানা ন অয় পরীক্ষেত বারবার ফেল গরে। তে যে কলেজত যায়। তা চিগোন সমাজ্জিরে ক্লাজত লাগত পেদ'। যে লাজ ডর ত্যাগ গোরি কলেজত পুরি তে আইএ পাজ গরে। তে আরও ডিগ্রি ভর্তি অয়। তে চিগোন চাগুরি লগে মানজরে কাম গোরি দিদু। সিত্তুন টেঙা পেলে তা মা ভেইরে তে দিদু। তার গায়সুয়ানা, হাম্মু দিগি ইক্কু মানজি চাগুরি দে। চাগুরিয়ান অলদে তে যি কাম গরা বাজে দে সিয়ান গরানা। পরেন্নি সরকারি চাগুরি পেব' তে সে আজায় ভাত রানা পিলে মাজানা হতে বেক্কানি গোরি দিদু। সেত্তুন ঠিকমত টেঙা পেদ' তে। তার গায়সুয়ানালোই তারে নোচিনুন, কোচপান পারা মানুজ নেই। ইক্কু তে বিএ পাজ। চিগোন ভেই ভার্সিটি আইন বিভাগত লেগা শেগার দুগ গোরি অলেও। তারা ভেই ইক্কু বেগত্তুন শিক্ষিত গম মানুজ।

পরিচিতি: চিজি খীসা, বিশিষ্ট কবি, লোগাঙ, খাগড়াছড়ি।

অজিত কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

নারাবি ছড়া

১৯-১০-২৯১৮ খ্রিঃ
নারাবি ছড়ার পানি ধারা
নিত্য যার গৈ ঝর-ঝরি
মা গঙ্গীর ভরন্দি দুধর
ঝুরি যায়্যা ধক্ গুরি।

ফাউনে চৈচে নিত্য থায়দে
বারিষা কাল্যা ধক গুরি
মা গঙ্গীর আর্শীবাদে
রাত ন-অয়দে কন দিন।
এধক অচল মৈন মুড়াত ত
পানি থাবার কধা নয়,
ভগবানর কধা ধগে
এই কামানি দোলে অয়।
ভরন্দি বাদাম ডুলুছুড়ি
ভাত-কাবরে উনা নোক
আদাম্যানোর ধনে-জনে
জনম ভুরি সুয়ে যোক ॥

পরিচিতি: অজিত কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (অবঃ), বিশিষ্ট কবি, সরকারী চাকুরে রাঙামাটি।

কে. শুদ্ধোধন তঞ্চঙ্গ্যা
“মঅনে মঅনে”

মঅনে মঅনে ভাবং অত তঅ-নাঙে
এককোআ কবিতা লেগিন
হালিক কেনে গই লেগিন
বারি সিরাত পই লুং।
জুনি তঞ্চঙ্গ্যা কারনি
দগে দগেনঅ-উলে
জুনি বাংলা করানি লোই
লেক-পেক উলে।
তুই কি মন দুগ পাবে পলনি
মঅ কবিতাবা মারায় সালে।
অর্ত্তে অর্ত্তে দেচ্ জা-র করানি
ভাবিলে মনান উলু জুলু উয়ে
আমা তঞ্চঙ্গ্যা করানিবো
দিন দিন লুগায় যাততোই,
আমা এলাফেলা কারনে।
সিয়ানি জুনি আমি সুগোই
নঅ তোই বনা নঅ বানি
তোয়লে কেনে গই আমি নাঙ দিবং
দুনিয়া মানোইত সুনর সিয়ত
আমি তঞ্চঙ্গ্যা এককোআ জাত আগি।

পরিচিতি: কে. শুদ্ধোধন তঞ্চঙ্গ্যা, বিশিষ্ট কবি, বাংলাদেশ বেতার রাঙামাটি।

রিপুল তঞ্চঙ্গ্যা

গম ওক ত পইত্ত দিনুন

গম ওক ত পইত্ত দিনুন
গম ওক ত পুরা জিংহানী আন..
নআ বছর বা জিনিক্কিয়্যা গমে
কারি গিয়ে সিনিক্কিয়্যা গই কারি
যোক পুরা জিংহানী আন।
কইয়ান নাঙে দাকিওং তয়ে,
ত পইত্ত নাঙে ম-মনান সিক গারি আগে...
সুগ সি গমপানা লেগা আগে
ই মন অ বিরে
ফাগইন মাইসত জুনো বইয়ার,
দক দক ফুল দক্কয়্যা গই
দগে রংএ-ঢংএ বাঁচি তোক
আমা গমপানা।
ফাগইন মাইস ঝ আহ্ন লগে
ম ই গমপানা বাসি আইসোক ত সেরু
আমা সি গমপানা বাঁচি তোক পুরা জিংহানী আন...!!

পরিচিতি : রিপুল তঞ্চঙ্গ্যা, ছাত্র,ইঞ্জিনিয়্যারিং, ৪র্থ বর্ষ মেরিন টেকনোলজি, ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি,সিরাজগঞ্জ।

জবা তঞ্চঙ্গ্যা

জা বুয়ত রাইচ পদ

জাবুই এক্কুনু আইল রঙ মইন পারি
তা দগখানি তগাত...
পুয়ানি দিনত দগখানি কায়
লয়অন কই এক্কয়া মানইত..!
মাইনস্যা অসদ গুনে পুয়ানি দিন বেয়াক
ওক,রঙ মোইন মুয়াগুন
আসি গিয়নোই আমা চোগ মুচয়েতুন
সি মইন-নুন ইক্কুনু কানি কানি
তা দকখান তগান।
আগে দিন্নত মইন,মুয়াগুন ঝাবুয়ানি
করক আসি মারি গম মারিত্তাক
সুগে তাইনাই মাইনতুনরে
দক দক ফুল,আর খাবা জিনিক দিরাক
সি বদলে আইস্যা মাইনত্তুন টানে
কানাইতন,তানে কাবিটন,
তানে বিচি নায় দাঙ মাইনতই অইরন
ইক্কুনু দিহুত মানইত আবাইতসেয়া দকিয়্যা
যান দেগন চান আম্মুয়ান
সেদ পাগি এ দুনিয়াত আ
দক পি'ন পা-বাক মইন,মুয়াগুন...
পুরা জিংহানী কানি কানি দিন কারাইবাক।

পরিচিতি : জবা তঞ্চঙ্গ্যা, শিক্ষার্থী, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।

শোভা তঞ্চঙ্গ্যা

তঞ্চঙ্গ্যা দুগ-অ ক-অ-রা

তঞ্চঙ্গ্যা দুগ-অ করা কায় কুব
বিন্ন্যা কামেনান বিল্ল্যা খারন
যে তাত্তুন উইট ন-অ আছে
মাইনসে করা দুইনান দুই
নিজ-অ জাততোয়ারে পুই ফেলারন।

তঞ্চঙ্গ্যা দুগ-অ করা কায় কুব
জুমত্তুন সন্ আনি বিসিনান
বিল্ল্যা উলে মত খারন
নিজ-অ জাততোয়ারে চিগুন গুইত্তন
টেঙ্গা দিনান বিদেশ-অ করা শিগতন
নিজ-অ ঐতিহ্য পুই ফেলারন।

সিক্ক্যা উলে ন-অ উব আমাত্তুন
আমা দেশত আমি তঞ্চঙ্গ্যা
আমাত্তুন আগে বার-অ বা গছা
আমাত্তুন নিজ-অ মাতৃভাষা
আমি অধিকার আমি লবং
কা-ও করা ন-শুনিবং
নিজ-অ জার দুগ করা
নিজ-অ জাততোয়ারে কুবং।

পরিচিতি : শোভা তঞ্চঙ্গ্যা, তঞ্চঙ্গ্যা সংবাদ পাঠিকা, বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি।

যাকোব ত্রিপুরা

মোলা তাংগ (দিন মজুর)

সালো তগো সালো চাগোই
ছগো ঠেলা গাড়ি
লামা কাচরক হয় মাচগোই
করই নোগ হোক।

সালো সাপুং সামুং তাংগ
কালায়ই বখোরনি ক্লমতই,
যত খাইয়ো হেলাসেলা
মায়া মুংসা মাখাং।

সালবাই হরবাই তাংগ সামুং
পুংয়া মাই ওবার,
কাইসা খাইয়া হামজাক-সুজাক
খাইয়ো হেলাসেলা।

সম টইয়া সুংনি পাইয়া মাই
সাঃপুং বরকো নোগ,
মাই ওবার খাগো লাগই
কাবই কাবই খুইয়ো্

যত খাকাগো বিনি বোরক চুংগো
কাইসা খাইয়া সাংনি বোরক,
তবুও চুং সুর খাতুই লই
নাইয়ো কাচাক্ এমাং।

পরিচিতি : যাকোব ত্রিপুর, উদীয়মান কবি, রাঙামাটি।

মলয় কিশোর ত্রিপুরার কয়েকটি কবিতা

১.

প্রেমের আস্তাচল
যদি কখনো ভুলে
ফিরিয়ে নিই চোখ
অভিমানে দিওনা আড়ি।
পাবো জানি অভয়ারন্যে
নীল সীমানা এড়িয়ে
করবেনা কোন বারাবারি।
বেদনার অব্যক্ত পদাবলী
নীলাচলে প্রেমের আস্তাচল
বারাবারি নূতন দিগন্তে
আর কবে পাবো বল?

লাজুক ও পদ্বীয়

১
যতো দুঃখ ঘোচাবো বাজি
সাপিবো তব মম মাঝে।
যতো যাতনা জুড়াইবে আজি
লুকিয়ে ললাট ওষ্ঠদ্বয়ে লাজে।

উদিত হউক রাঙা স্বপন
প্রেম বিলাপে করিবো বপন
তোর মোর অবসর যাপন
মোর প্রিয়ার হিয়ার সাজে।

২.
তীরন্দাজ চোখ

যতি ভুল করে কখনো ডাকি,
দিওনা সাড়া।
যদি কখনো অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে
থাকি,
হয়ো না আত্মহারা।

তীরন্দাজ চোখে অজুত উদাসীনতা
দিতে পারি আজন্ম স্বাধীনতা
যেতে চাওতো চলে যেতে পারো
কখনো বলবো না কাছে এসো
আরো।
মলয় কিশোর ত্রিপুরার চোখে
সহস্র রঙিন প্রজাপতি-
আসতে চাওতো
তবে করবোনা কোন আপত্তি।

২
লজ্জাবতীর লাজ
তীরন্দাজ চোখে লাজুক ছায়া
লজ্জাবতীর লাজে কিংশুক কায়া।
অফুরান ভালবাসা সাজে,
তাইতো নির্বাক তাকিয়ে থাকি
মাঝে মাঝে।

পরিচিতি : মলয় কিশোর ত্রিপরা, বিশিষ্ট কবি, রাঙামাটি।

হ্লাপ্রুসাইন মারমা (সাইন)
মাহাঃ সাংগ্রাই লাবারেই

হুই তইংপইং এ্য হুইমালেই মাহাঃ সাংগ্রাই লাবারেই।
মাহাঃ সাংগ্রাইগো হ্নিঃগা থালু লুরোমালেই
অলুক আক্রাই আমিয়াগ্রী পুও বারেই।
মাহাঃ সাংগ্রাই পাইলালিই লুরো চেইলেই
আমিয়াগ্রী চইংজা রকলা লিই।
মাহাঃ সাংগ্রাই বিজু ইংমা হিংচা
ওয়াইং ছাইং রংখিয়াফো চেইতাইলু
মুইসাজুক অঃখ্রোও তাকপারেই।
তাহ্ খ্রারোমালেই মাহাঃ সাংগ্রাইমা অপ্যগো
থালু রাইংমা কাং বিইমা কাং ফ্রইপারেই।
মাহাঃ সাংগ্রাই এ্যদিক বেইগা হুই অহংমা মংকংচা,
মঃলুচাগো ভইংলু অঃকং অক্রইং আঃচাং
অরলে অস্যইকু, ক্রুও ছু য়োচা।
তঃয়্যক কা তঃয়্যক, তাসাংগা- তাসাং রাইংমাই
অখ্রোও হিংগেই ফ্রেইসাংলু মৈত তারা গাবো
কুও কিজু সাঃমিয়া কিজু অরলে অমিয়োবাসা
টুটাক লইয়্যং ক্যং তাক লু শিলা চংচা রাক।
মাহাঃ সাংগ্রাই সুংরাক ফ্রইপারেই পাইংছুওয়াই রাক,
আঃকিয়া রাক অরলে আঃপিয়াইং রাক।
এ্য সুংরাক কু হ্নিঃ হ্নিঃ গাবাং হুই তইং
আগ্রী এ্যরেই কিয়াংপালু লাবারেই।

পরিচিতি : হ্লাপ্রুসাইন মারমা (সাইন), বিশিষ্ট কবি, রাঙামাটি।

বাংলা অনুবাদঃ

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও মহান সাংগ্রাই আসিতেছে।
মহান সাংগ্রাইকে সামনে রেখে মানুষের কর্ম ব্যস্থতা অনেক বারেই।
মহান সাংগ্রাই যত ঘনিয়ে আসছে তত মানুষের মনে দুঃচিন্তা বেরে যায়।
মহান সাংগ্রাই জন্য বাড়িতে জিনিসপত্র বিক্রি নিয়ে পরিবারে অশান্তি বারে।
অন্য জনের মহান সাংগ্রাই আনন্দকে
রেখেই ঝগড়া জাতি আর বিপদ আপদ ছারে না।
মহান সাংগ্রাই মূল হচ্ছে পুরাতন বছরে খারাপ গুলো, অপ্রয়োজনগুলো
ফেলে দিয়ে ভালোগুলো, চকচকে পরিস্কার গুলো এবং নতুনকে
সারম্ভরে সু-স্বাগতম জানিয়ে বরণ করে নেয়া।
এক জনে সাথে অন্য জন, এক দল সাতে অন্যদল ঝগড়া জাতি বিবাদ
থাকলে
মিমাংসা মাধ্যমে মৈত্রী আবদ্ধ হয়ে নিজের জন্য অপর জন্য এবং
দেশসহ জাতির উন্নতি লক্ষে বৌদ্ধ বিহারে শীল পালন করা।
মহান সাংগ্রাই তিন দিন হচ্ছে ফুল ছেড়া দিন, মূল দিন এবং
উড়ে যাওয়া দিন, এ তিন দিনকে অনেক পুরনো থেকে প্রতি বছর
বড় আকারে পালন করে আসিতেছে।

এ অহ্‌রিঙ ধাভাদেনা দিনত
যেন আহ্‌ঝি ন'যায়

বনযোগীছড়া কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সমিতি

চিতদিঘোল কোচপানা

জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক)

রাঙামাটি পার্বত্য জেলা

রদংকাবা -১২৭

রতন বা রদং কাবার পটভূমি

রতন কাবা থেকে রদংকাবা। কালের বিবর্তনে এটির নামের পরিবর্তন ঘটেছে। প্রায় দুইশ বছর আগেকার কথা তখন ঐ অঞ্চলে বনযুই পাংখোয়াদের বসবাস ছিল। তৎকালীন সময়ে রতন নামে একটি ধনাঢ্য চাকমা পরিবার ছিল। অন্যান্যদের তুলনায় তার প্রচুর সম্পত্তি থাকায় তার অহংকারও ছিল প্রচুর পরিমাণে। গরীবদেরকে সে পাত্তা দিত না, পাংখোয়াদেরতো আরও বেশি। বনযুই পাংখোরা তাদের বাজার সদাইয়ের জন্য রতন চাকমার বাড়ির সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করত। পাংখোরা তার কাছে থেকে কোনদিন ভাততো দূরের কথা পানি পর্যন্ত খেতে পেতো না। সেজন্য পাংখোরা তার আচরনে ক্ষুব্ধ হয়ে একদিন রতন চাকমাকে কেটে ফেলে। সেই থেকে ঐ স্থানের নাম রতন কাবা হয়ে গেল। স্থানীয় লোকজনের তথ্যমতে এখনও ঐ স্থানে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা রাতে অদ্ভুদ শব্দ শোনা যায়।